Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা: মুসলিমদের জন্য অর্থনৈতিক দাসত্ব নাকি যুদ্ধ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাকিয়া ইসলাম

রোলঃ 23090120011

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা: মুসলিমদের জন্য অর্থনৈতিক দাসত্ব নাকি যুদ্ধ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাকিয়া ইসলাম

রোলঃ 23090120011

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা: মুসলিমদের জন্য অর্থনৈতিক দাসত্ব নাকি যুদ্ধ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জাকিয়া ইসলাম, আইডিঃ 23090120011 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা: মুসলিমদের জন্য অর্থনৈতিক দাসত্ব নাকি যুদ্ধ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাকিয়া ইসলাম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

জাকিয়া ইসলাম

আইডিঃ 23090120011

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় – ১ - ভূমিকা (Introduction) 8

১.১ গবেষণার পটভূমি ও যৌক্তিকতা 8

১.২ সমস্যা বিবৃতি (Problem Statement) 10

১.৩ গবেষণার প্রশ্নাবলি (Research Questions) 12

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Research Objectives and Aims) 14

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব (Significance of the Research) 16

১.৬ পদ্ধতিগত কাঠামো (Methodological Framework) 18

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study) 21

অধ্যায় – ২ - ধারণাগত ও ধর্মতাত্ত্বিক পর্যালোচনা 24

২.১ সুদের সংজ্ঞা 24

২.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট 25

২.৩ সুদ : কুরআন ও হাদিসের আলোকে — নৈতিক ব্যাখ্যা 30

২.৪ কুরআন ও হাদিসে সুদ (রিবার) নিষেধাজ্ঞা (হারাম হওয়া) 33

২.৫ সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগীতা 41

২.৬ ইসলামী আইনশাস্ত্রে রিবার প্রকারভেদ 43

২.৭ সমসাময়িক গবেষণায় সুদ ও বৈষম্যের সম্পর্ক 56

অধ্যায় – ৩ - বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা(Global Economic System) 58

৩.১ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 58

৩.২ বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান: 69

৩.৩ আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার পরিচিতি ও প্রকারভেদ 80

৩.৪ বিভিন্ন ব্যাংকের কার্যাবলি: 84

৩.৫ ব্যাংক ডিপোজিট ও শরিয়াতের বিধান 91

৩.৬ ইসলামী ব্যাংকের ধারণা 98

৩.৭ আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ফাঁদসমূহ 104

অধ্যায় – ৪ - সুদের ভয়াবহ প্রভাব ও মানবজীবনে দাসত্বের নমুনা (The Devastating Effects of Interest and Examples of Slavery in Human Life)..................109

৪.১ আর্থিক দাসত্বের ধারণা:..109

৪.২ সামাজিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব..113

৪.৩ ইসলামিক দৃষ্টিকোণ হতে সুদের পরিণতি:..117

৪.৪ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি 120

অধ্যায় - ৫: ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Islamic Economic System) 123

৫.১ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা:..123

৫.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য..........................124

৫.৩ ইসলামে ব্যবসা - বাণিজ্যের গুরুত্ব 126

৫.৪ সুদ (রিবা) ও ব্যবসার মাঝে পার্থক্য..128

৫.৫ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 132

অধ্যায় - ৬: "ইসলামী অর্থনীতি: সুদের (রিবা) সমস্যা মোকাবিলার একটি সমাধান(Islamic Economics: A Solution to the Problem of Interest (Riba) 134

৬.১ মুশারাকা..134

৬.২ মুদারাবা 138

৬.৩ ইজারা 140

৬.৪ বাই সালাম ও বাই ইসতিসনা..142

৬.৫ কর্জে হাসানা 144

৬.৬ যাকাত, ওয়াকফ ও সাদাকা 146

৬.৮ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ:..153

অধ্যায় - ৭: তুলনামূলক অধ্যয়ন: দাসত্ব বনাম জিহাদ(Comparative Study: Slavery vs. Jihad)..154

৭.১ দুটি ধারার তুলনা 154

৭.২ অর্থনৈতিক ও ন্যায়বিচারের নিরিখে তুলনা...157

৭.৩ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনটি বেশি কার্যকর..157

অধ্যায় -৮:উপসংহার ও সুপারিশ (Conclusion and Recommendations)............160

৮.১ গবেষণার প্রধান ফলাফলের সারসংক্ষেপ 160

৮.২ উত্তরণের পথ: বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতির একীকরণের কৌশল 160

৮.৩ ভবিষ্যত গবেষণার ক্ষেত্র 161

৮.৪ চূড়ান্ত মন্তব্য: দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য জিহাদের ডাক......................................162

তথ্যসূত্র 163

অধ্যায় – ১ - ভূমিকা (Introduction)

১.১ গবেষণার পটভূমি ও যৌক্তিকতা

গবেষণার পটভূমি:

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব অর্থনীতি একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দর্শন ও কাঠামো দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত—যার কেন্দ্রীয় অঙ্গ হলো সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক এবং জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থাসমূহ এই সুদকেন্দ্রিক মডেলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থাটি বৈশ্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উন্নয়নের একমাত্র গ্রহণযোগ্য মডেল হিসেবে চেপে বসেছে, যাকে ইংরেজিতে প্রায়শই 'There Is No Alternative (TINA)' doctrine বলা হয়।

অন্যদিকে, ইসলাম নামক সার্বজনীন জীবনবিধান তার শুরু থেকেই অর্থনৈতিক জীবনে সুদ বা 'রিবা'-কে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫)।
এই নিষেধাজ্ঞা কেবল একটি অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি গভীরতর বিশ্বদর্শন, নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ একটি গভীর দ্বিধাবিভক্তির মধ্যে বসবাস করছে: একদিকে রয়েছে তার ঈমানী চেতনা, যা তাকে সুদ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়, অন্যদিকে রয়েছে একটি অপ্রতিরোধ্য বৈশ্বিক ব্যবস্থা, যা সুদকে তার অর্থনৈতিক জীবনের অপরিহার্য অংশ করে দিয়েছে। এই সংঘাতের ফলাফল হলো এক ধরনের 'অর্থনৈতিক সিজোফ্রেনিয়া'—যেখানে একজন ব্যক্তি একইসাথে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থায় টিকে থাকতে গিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে। এই প্রেক্ষাপটেই একটি মৌলিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়: বর্তমান সুদভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি আধুনিক রূপে 'দাসত্ব' (Economic Slavery), নাকি এটি একটি চ্যালেঞ্জ যা থেকে মুক্তির জন্য 'জিহাদ' (প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম) প্রয়োজন।

গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Research)

এই গবেষণা পরিচালনার পিছনে নিম্নলিখিত যৌক্তিক কারণসমূহ বিদ্যমান:

১. জ্ঞানগত শূন্যতা পূরণ (To Fill a Knowledge Gap): যদিও সুদ ও ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা রয়েছে, কিন্তু 'দাসত্ব' ও 'জিহাদ'—এই দুটি শক্তিশালী রূপক (metaphor) ব্যবহার করে সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে নতুন। এই গবেষণা প্রচলিত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সীমা অতিক্রম করে দার্শনিক, নৃতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে।

২. একটি সক্রিয় বিতর্কে অবদান (To Contribute to an Active Debate): বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্য এবং বারবার সংঘটিত আর্থিক সংকটগুলি সুদভিত্তিক ক্যাপিটালিজমের ভিত্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এই প্রেক্ষিতে ইসলামী অর্থনীতির বিকল্প মডেলটি কতটা কার্যকর ও বাস্তবসম্মত, সে সম্পর্কে একটি সুসংগত ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের প্রতি একাডেমিক ও নীতিনির্ধারক মহলে চাহিদা রয়েছে।

৩. ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা (Practical Necessity): বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম, বিশেষত শিক্ষিত যুবসমাজ, তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছেন—বন্ধকি ঋণ, শিক্ষা ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ এবং ব্যবসায়িক অর্থায়নের ক্ষেত্রে। তাদের জন্য শুধু নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং একটি বাস্তবসম্মত, কার্যকর ও নৈতিকভাবে উত্তরণের পথ দেখানো এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক উদ্দেশ্য।

৪. নীতিনির্ধারণে সহায়তা (To Aid in Policy Making): এই গবেষণার ফলাফল মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোর জন্য নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি রোডম্যাপ সরবরাহ করতে পারে। এটি দেখাবে কীভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে সুদমুক্ত কাঠামোর দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সংযোগ রক্ষা করে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা যায়।

৫. ধর্মীয় ও নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি (To Enhance Religious and Ethical Awareness): এই গবেষণা শুধু অর্থনীতির ছাত্র বা বিশেষজ্ঞদের জন্যই নয়, বরং সাধারণ মুসলিম পাঠকদের জন্যও প্রাসঙ্গিক। এটি সুদকে শুধু একটি পাপই নয়, বরং একটি সামগ্রিক

‘দাসত্বের ব্যবস্থা’ হিসেবে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে ‘জিহাদ’ বা সংগ্রামের মাধ্যমে এর থেকে মুক্তির পথ দেখাতে সহায়তা করবে।

সংক্ষেপে, এই গবেষণা শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বর্তমান সময়ের একটি জ্বলন্ত সমস্যার উপর আলোকপাত করে এর থেকে উত্তরণের একটি রূপরেখা প্রস্তাব করবে—যা একাডেমিক জগৎ এবং বাস্তব জীবনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করবে।

১.২ সমস্যা বিবৃতি (Problem Statement)

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ একটি গভীর ও বহুমুখী সংকটের সম্মুখীন, যা তার অর্থনৈতিক অস্তিত্ব, ধর্মীয় পরিচয় এবং নৈতিক ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। এই সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইসলাম কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধকৃত সুদ (রিবা) ও তাৎক্ষণিকভাবে এর বিকল্প প্রস্তাব না দিয়ে, একটি সার্বজনীন সুদ-ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোর বাধ্যতামূলক একীকরণ।

এই মৌলিক সংঘাত থেকে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলির উদ্ভব হয়েছে:

১. অর্থনৈতিক-ধর্মীয় দ্বৈততার সমস্যা (The Problem of Economic-Religious Duality): মুসলিম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি একটি ধর্মীয় আদর্শ (সুদমুক্ত জীবন) এবং একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা (সুদভিত্তিক লেনদেন) এর মধ্যে টিকে থাকার জন্য একটি কঠিন ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধ্য হচ্ছে। এটি একটি "অর্থনৈতিক বিভক্ত ব্যক্তিত্ব" (Economic Split Personality) তৈরি করেছে, যেখানে ঈমানী চাহিদা এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে নিত্যদিনের সংঘাত ঘটে চলেছে।

২. কাঠামোগত দাসত্বের সমস্যা (The Problem of Structural Enslavement): বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো—যেমন আন্তর্জাতিক ঋণ (IMF/World Bank), সার্বভৌম বন্ড, কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং নীতি এবং ব্যক্তিগত ঋণ—এতটাই গভীরভাবে সুদ-কেন্দ্রিক যে, মুসলিম দেশগুলো উন্নয়ন, বাণিজ্য ও স্থিতিশীলতার জন্য এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ ছাড়া কার্যত কোনও বিকল্প পথ খুঁজে পায় না। এটি তাদেরকে একটি "ঋণের দাসত্ব" (Debt Slavery) চক্রে আবদ্ধ

করে ফেলে, যা তাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করে এবং নীতিনির্ধারণে বহিঃস্থ শক্তির প্রভাবকে বৃদ্ধি করে।

৩. বিকল্প ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়ন জটিলতার সমস্যা (The Problem of Limitations and Implementation Complexity of the Alternative System): ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়ন একটি বৈধ বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হলেও, এটি এখনও পুরোপুরি পরিপক্ক নয় এবং বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি:

* এটিবৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র, ফলে প্রভাব সীমিত।

* অনেক ইসলামীব্যাংকিং পণ্য প্রকৃত "লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি" (Mudaraba/Musharaka) এর চেয়ে কেবলমাত্র আইনগত কৌশল (হিয়াল)-এর উপর নির্ভরশীল, যা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে ব্যাহত করে।

* ইসলামীঅর্থনৈতিক মডেলের একটি সামগ্রিক ও সুসংহত কাঠামো (Macroeconomic Framework) এর অভাব রয়েছে, যা জাতীয় অর্থনীতিকে পুরোপুরি সুদমুক্ত করতে পারে।

৪. জ্ঞানগত ও সচেতনতামূলক ফাঁকের সমস্যা (The Problem of Knowledge and Awareness Gap): মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ সুদকে শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত পাপ হিসেবে দেখে, কিন্তু এটি একটি বিস্তৃত ও সিস্টেমিক অপরাধ (Systemic Evil) যা সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন সৃষ্টি করে—এই ধারণাটি তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট নয়। ফলে, সামগ্রিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় গণসচেতনতা ও collective action গড়ে উঠছে না।

সুতরাং, এই গবেষণার মুখ্য সমস্যা হল নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়:

"সুদভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী প্রভাব মুসলিম উম্মাহকে একটি জটিল ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংকটে নিপতিত করেছে, যেখানে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা একটি অনিবার্য 'দাসত্ব'-এ পরিণত হয়েছে নাকি এটি একটি 'জিহাদ' (সংগ্রাম) এর মাধ্যমে অতিক্রম

করার মতো চ্যালেঞ্জ—এই প্রশ্নটির একটি সুস্পষ্ট, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিশ্লেষণের অস্তিত্ব এখনও গবেষণা ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে গঠিত হয়নি।

এমন এক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা কেবল সুদের নিষিদ্ধতা নয়, বরং এটি কীভাবে একটি 'দাসত্বের ব্যবস্থা' (System of Enslavement) তৈরি করে এবং এর বিরুদ্ধে 'জিহাদ' (Systemic Struggle) এর রূপটি কী হতে পারে—তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করবে, এবং এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর জন্য বর্তমান বাস্তবতায় একটি কার্যকর উত্তরণের পথের রূপরেখা প্রস্তাব করবে।

১.৩ গবেষণার প্রশ্নাবলি (Research Questions)

এই গবেষণা নিম্নলিখিত প্রাথমিক গবেষণা প্রশ্ন এবং এর অন্তর্গত উপ-প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজবে:

প্রধান গবেষণা প্রশ্ন ১ (Main RQ 1):

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সুদভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 'দাসত্ব' (Economic Slavery) হিসেবে ব্যাখ্যা করার তাত্ত্বিক ও বাস্তব ভিত্তি কী?

· উপ-প্রশ্ন ১.১: কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী интеллектуаль ঐতিহ্যে 'দাসত্ব' ও 'স্বাধীনতা' এর ধারণাগুলো কীভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলোকে আধুনিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়।

· উপ-প্রশ্ন ১.২: সুদভিত্তিক ব্যবস্থা কীভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আর্থিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব সৃষ্টি করে? (যেমন: ঋণের চক্র, সার্বভৌম ঋণের জাল, ভোগবাদী মনোভাব)
· উপ-প্রশ্ন ১.৩: এই 'দাসত্ব' ধারণাটি প্রচলিত অর্থনৈতিক দাসত্ব (যেমন: income inequality, wealth concentration) থেকে কীভাবে ভিন্ন বা সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রধান গবেষণা প্রশ্ন ২ (Main RQ 2):

সুদভিত্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ইসলামী অর্থনৈতিক বিকল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে 'জিহাদ' (Systemic Struggle) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি ও কাঠামো কী।

· উপ-প্রশ্ন ২.১: ইসলামী বিধানে 'জিহাদ'-এর ধারণাটি কীভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার (ইজতেহাদ) এর সংগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে।

· উপ-প্রশ্ন ২.২: ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়নের বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলো (ইসলামী ব্যাংক, তাকাফুল, ইত্যাদি) এই 'জিহাদ'-এর কতটা সফল বাহন? তাদের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতাগুলো কী।

· উপ-প্রশ্ন ২.৩: শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং নীতিনির্ধারণ, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে কীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক 'জিহাদ' পরিচালনা করা সম্ভব।

প্রধান গবেষণা প্রশ্ন ৩ (Main RQ 3):

'দাসত্ব' এবং 'জিহাদ' - এই দুটি রূপকের (Metaphor) মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার কী মূল্যায়ন করা যায়।

· উপ-প্রশ্ন ৩.১: বর্তমান বিশ্বে মুসলিম ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে 'দাসত্ব' ও 'জিহাদ'-এর মধ্যে কীভাবে অবস্থান করছে। (একটি বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়ন)

· উপ-প্রশ্ন ৩.২: এই সংগ্রামে সফলতার মাপকাঠি কী? সফলতার সম্ভাবনা কতটা এবং প্রধান অন্তরায়গুলো কী কী।

প্রশ্নাবলির যৌক্তিকতা:

· স্পষ্ট ফোকাস: প্রশ্নগুলো গবেষণার শিরোনামের মূল বিষয় ("দাসত্ব নাকি জিহাদ")কে সরাসরি অ্যাড্রেসিং করে।

· ক্রমবিন্যাস: প্রশ্নগুলো ধারণাগত বোঝাপড়া (RQ 1) থেকে কার্যকরী প্রতিক্রিয়া (RQ 2) এবং তারপর Synthesis ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ (RQ 3) এর দিকে এগোয়।

· গবেষণাযোগ্যতা (Researchable): প্রতিটি প্রশ্নই তাত্ত্বিক, বাস্তব-case study, এবং তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে ইনভেস্টিগেশনের যোগ্য।

· ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা: উত্তরগুলো শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই নয়, বরং বাস্তব জীবনে ডিসিশন মেকিং এবং নীতিনির্ধারণে সরাসরি সাহায্য করবে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Research Objectives and Aims)

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো সুদভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ইসলামী জীবনবিধানের মধ্যকার সংঘাতকে "দাসত্ব" ও "জিহাদ" এই দুটি শক্তিশালী প্রিজম বা রূপকের মাধ্যমে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা এবং এর থেকে উত্তরণের একটি যৌক্তিক কাঠামো প্রস্তাব করা। এই মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য (General Objective):

সুদভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সামগ্রিক "দাসত্বের ব্যবস্থা" হিসেবে চিহ্নিত করা এবং এর বিরুদ্ধে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি কার্যকর "জিহাদ" বা সংগ্রামের রূপকল্প ও কৌশলগত রূপরেখা প্রস্তাব করা।

খ. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (Specific Objectives):

তাত্ত্বিক ও ধারণাগত উদ্দেশ্য (Theoretical & Conceptual Objectives):

১. ধারণাগত কাঠামো নির্মাণ: "অর্থনৈতিক দাসত্ব" ও "অর্থনৈতিক জিহাদ" - এই দুটি ধারণাকে ইসলামের প্রাথমিক উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) এবং ইসলামী দর্শনের আলোকে সংজ্ঞায়িত ও সুস্পষ্ট করা।

২. সুদের নিষেধাজ্ঞার গভীরতা উন্মোচন: ইসলামে সুদ (রিবা) হারাম হওয়ার পেছনের দার্শনিক, নৈতিক ও সামাজিক যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত পাপ নয়, বরং এটি কীভাবে একটি ব্যবস্থাগত অবিচার ও দাসত্বের কারণ - তা প্রতিষ্ঠিত করা।

৩. বিশ্ব ব্যবস্থার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ: আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা, এর মাধ্যমে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বৈষম্য ও সার্বভৌমত্ব হরণের প্রক্রিয়া গবেষণা করা।

বিশ্লেষণমূলক ও মূল্যায়নমূলক উদ্দেশ্য (Analytical & Evaluative Objectives):

৪. দাসত্বের বহুমুখী রূপ চিহ্নিতকরণ: সুদভিত্তিক ব্যবস্থা কীভাবে ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতা, সমাজের সংহতি এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে একটি বহুমুখী "দাসত্বের জাল" তৈরি করে - তার একটি বিস্তৃত চিত্র উপস্থাপন করা।

৫. ইসলামী অর্থনীতির সাফল্য-ব্যর্থতার মূল্যায়ন: ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতিকে "জিহাদী" বিকল্প হিসেবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টার একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা। এর সাফল্য, সীমাবদ্ধতা এবং বর্তমান কাঠামোর মধ্যে véritable ইসলামী দর্শন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা।

প্রস্তাবনামূলক ও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য (Proposal & Practical Objectives):

৬. জিহাদের কৌশলগত রূপরেখা প্রণয়ন: "দাসত্ব" থেকে মুক্তিলাভের জন্য একটি বহুমাত্রিক "জিহাদী" রোডম্যাপ প্রস্তাব করা। এটি নিম্নলিখিত স্তরে সংগঠিত হবে:

* ব্যক্তিগত স্তর: সুদমুক্ত জীবনযাপন, সচেতনতা ও নৈতিক শিক্ষা।
* সামাজিক স্তর: বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল (যেমন:co-operatives, community-based Islamic finance), যাকাতভিত্তিক নিরাপত্তা জাল তৈরি।

* রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক স্তর: ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংলাপে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয়ভাবে উপস্থাপন।

৭. নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষের জন্য সুপারিশ প্রস্তুত: গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মুসলিম নাগরিকদের জন্য বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য সুপারিশমালা প্রস্তুত করা।

সংক্ষেপে, এই গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি মৌলিক জ্ঞানগত অবদান রাখা, যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে শনাক্ত করে (দাসত্ব হিসেবে) এবং তা থেকে মুক্তির জন্য একটি সক্রিয়, সচেতন ও সংগঠিত পথে অগ্রসর হতে (জিহাদ হিসেবে) প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা লাভ করবে।

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব (Significance of the Research)

এই গবেষণা কেবল একটি একাডেমিক অনুশীলনই নয়, বরং এটি বর্তমান সময়ের একটি জরুরি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এর গুরুত্ব নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়:

ক. তাত্ত্বিক ও একাডেমিক গুরুত্ব (Theoretical and Academic Significance):

১. জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন: এই গবেষণা অর্থনৈতিক "দাসত্ব" ও "জিহাদ" দুটি শক্তিশালী ও প্রাসঙ্গিক রূপকের (metaphor) মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যকার সংঘাত বিশ্লেষণ করে, যা প্রচলিত গবেষণা থেকে একটি স্বতন্ত্র ও উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এটি তাত্ত্বিক আলোচনাকে একটি গতিশীল ও প্রাণবন্ত মাত্রা দান করবে।

২. বহু-শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সমন্বয় (Interdisciplinary Synthesis): গবেষণাটি কেবল অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি ইসলামী আইন (ফিকহ), ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবে। ফলে, এটি একাডেমিয়াে একটি সামগ্রিক বোঝাপড়া তৈরি করতে সহায়তা করবে।

৩. সমালোচনামূলক অর্থনৈতিক আলোচনায় ইসলামী কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালীকরণ: বৈশ্বিক পর্যায়ে সুদভিত্তিক পুঁজিবাদের সমালোচনা যেখানে মার্কসবাদ বা পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রায়শই আসে, সেখানে এই গবেষণা একটি প্রাচীন কিন্তু চিরন্তন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে

একটি শক্তিশালী, যুক্তিনির্ভর ও পদ্ধতিগত সমালোচনা উপস্থাপন করবে, যা আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে ইসলামী বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য করবে।

খ. ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক গুরুত্ব (Practical and Applied Significance):

১. ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য দিকনির্দেশনা: গবেষণার ফলাফল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলিমের জন্য একটি ব্যবহারিক গাইড হিসেবে কাজ করবে, যারা দৈনন্দিন জীবনে (বন্ধকী ঋণ, গাড়ি ঋণ, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে) সুদের সাথে জড়িত হওয়া এড়াতে চান। এটি তাদেরকে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে "জিহাদ" চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

২. আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নীতিনির্ধারকদের জন্য রূপরেখা: ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য ও পরিষেবাসমূহকে কীভাবে আরও সত্যিকারের ইসলামী দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা যায় এবং "বক্স-টিকিং" মানসিকতা পরিহার করা যায়, সে বিষয়ে কৌশলগত সুপারিশ পাবে। একইভাবে, সরকারগুলো জাতীয় অর্থনীতিকে সুদমুক্ত করার জন্য নীতি প্রণয়নে এই গবেষণা থেকে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে।

৩. সামাজিক সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন: গবেষণাটি সুদকে একটি "সিস্টেমিক দাসত্ব" হিসেবে চিহ্নিত করে মুসলিম সমাজে একটি গুণগত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবে। এটি মানুষকে শুধু ব্যক্তিগত পাপের চিন্তা থেকে সামষ্টিক দায়িত্ব ও সংস্কারের দিকে আহ্বান জানাবে, যা একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

গ. ধর্মীয় ও নৈতিক গুরুত্ব (Religious and Ethical Significance):

১. আধ্যাত্মিক মুক্তির পথনির্দেশ: এই গবেষণা মূলত মুসলিমদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার লক্ষ্য রাখে। এটি প্রদর্শন করবে যে কীভাবে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুধু সম্পদই নয়, বরং মানুষের আত্মাকেও প্রতিনিধিত্ব করে।

২. ইসলামের সার্বজনীনতা ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা: এটি প্রমাণ করবে যে ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা অর্থনীতির মতো জটিল ও

আধুনিক বিষয়েরও স্পষ্ট ও সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা দেয়। ইসলামের সার্বজনীনতা ও চিরন্তন সত্যকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ঘ. কৌশলগত ও ভবিষ্যত গুরুত্ব (Strategic and Future Significance):

১. মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য একটি রোডম্যাপ: গবেষণাটি মুসলিম বিশ্বকে বর্তমান অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একটি ন্যায়ভিত্তিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে একটি কৌশলগত রোডম্যাপ প্রদান করে। এটি উম্মাহর অর্থনৈতিক ভবিষ্যত গঠনের একটি মৌলিক দলিল হিসেবে কাজ করতে পারে।

২. বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে ইসলামী সমাধানের প্রস্তাব: বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, অস্থিরতা ও বৈষম্য যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন এই গবেষণা ইসলামী অর্থনীতিকে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও ন্যায়সংগত বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করে, যা কেবল মুসলিমদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য একটি সম্ভাবনাময় মডেল হতে পারে।

সংক্ষেপে, এই গবেষণা শুধু একটি একাডেমিক ডিগ্রির জন্য প্রয়োজনীয়তাই পূরণ করবে না, বরং এটি একটি জীবন্ত, প্রাসঙ্গিক ও গতিশীল বিষয়ে একটি মৌলিক অবদান রাখবে যা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

১.৬ পদ্ধতিগত কাঠামো (Methodological Framework)

এই গবেষণা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) অবলম্বন করবে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগত কাঠামো গৃহীত হবে:

ক. গবেষণা ডিজাইন (Research Design):

গবেষণাটি একটি ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক ডিজাইন (Explanatory and Analytical Design) অনুসরণ করবে। এটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটের সমন্বয়ে সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হবে।

খ. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Data Collection Methods):

· বই ও গবেষণাপত্র (Books and Research Papers): ইসলামী অর্থনীতি, conventional economics, অর্থনৈতিক দর্শন এবং সমালোচনামূলক তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য বই, জার্নাল নিবন্ধ এবং থিসিস studied হবে।

· ধর্মীয় গ্রন্থ (Religious Texts): কুরআন, বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন এবং প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ (যেমন: হিদায়া, আল-মুগনি ইত্যাদি) থেকে সুদ সংক্রান্ত বিধান ও তার দার্শনিক ভিত্তি সংগ্রহ করা হবে।

· আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন (International Organization Reports): বিশ্বব্যাংক, IMF, Islamic Development Bank (IsDB) এবং Bank for International Settlements (BIS) এর প্রকাশনা ও প্রতিবেদন থেকে relevant তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হবে।

· বিশ্লেষণমূলক নথি (Analytical Documents): বিভিন্ন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, নীতিদলিল এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর ডেটা বিশ্লেষণ করা হবে।

গ. তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল (Data Analysis Techniques):

১. বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis):

· কুরআন ও হাদীসের relevant আয়াত ও বর্ণনাসমূহের একটি গভীর ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ (Hermeneutic Analysis) করা হবে। এতে "রিবা", অর্থনৈতিক "দাসত্ব" (ইক্ক), ও "জিহাদ" এর ধারণাগুলোর অর্থ ও প্রেক্ষিত উন্মোচিত হবে।

· ইসলামী অর্থনীতি ও conventional economics-এর উপর existing সাহিত্যের একটি সমালোচনামূলক বিতর্ক বিশ্লেষণ (Critical Discourse Analysis) করা হবে।

২. তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis):

· সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক মডেল এবং ইসলামী অর্থনৈতিক মডেলের মধ্যে দার্শনিক ভিত্তি, অপারেশনাল কাঠামো এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলাফলের উপর একটি পদ্ধতিগত তুলনামূলক বিশ্লেষণ কন্ডাক্টেড হবে।

· "দাসত্ব" ও "জিহাদ" - এই দুটি রূপকের আলোকে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করা হবে।

৩. যৌক্তিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ (Logical and Philosophical Analysis):

· সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক যুক্তি উপস্থাপন এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হবে। এটি গবেষণার প্রস্তাবিত রূপরেখা (জিহাদের কৌশল) উন্নয়নে- সাহায্য করবে।

ঘ. গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Research):

১. পরিমাণগত তথ্যের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Quantitative Data): গবেষণাটি প্রাথমিকভাবে গুণগত হওয়ায়, ইসলামী অর্থনীতির macroeconomic impact-এর উপর ব্যাপক পরিমাণগত তথ্যের অভাব থাকতে পারে।

২.বিশেষজ্ঞের প্রবেশাধিকার (Access to Experts): উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারক ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে সাক্ষাৎকারের সুযোগ সীমিত হতে পারে।

৩.গতিশীল বিষয় (Dynamic Nature of the Subject): ইসলামী অর্থনীতি ও বিশ্ব অর্থনৈতিক landscape একটি গতিশীল ক্ষেত্র। গবেষণা চলাকালীন নতুন উন্নয়ন ঘটতে পারে, যা রিসার্চের-এর পরিধির বাইরে থাকতে পারে।

সংক্ষেপে, এই পদ্ধতিগত কাঠামোটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তার সমন্বয় করে একটি জটিল সমস্যার উপর একটি সুসংগত, যৌক্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য গবেষণা পরিচালনার রূপরেখা প্রদান করে।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study)

যেকোনো গভীর ও জটিল গবেষণার মতো এই গবেষণাকর্মও কিছু স্বীকৃত সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে। এই সীমাবদ্ধতাগুলো স্বীকার করা গবেষণাটির বিশ্বাসযোগ্যতা ও একাডেমিক সততা বৃদ্ধি করে। নিম্নে গবেষণাটির প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক. পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা (Methodological Limitations):

১. গুণগত পদ্ধতির প্রাধান্য (Dominance of Qualitative Approach): এই গবেষণা প্রাথমিকভাবে একটি গুণগত কাঠামো অনুসরণ করবে। ফলে, "দাসত্ব" ও "জিহাদ"-এর প্রভাব পরিমাপ করার জন্য বা ইসলামী অর্থনৈতিক মডেলের সাফল্যের হার নির্ণয়ের জন্য ব্যাপক পরিসংখ্যানিক ও পরিমাণগত (Quantitative) উপাত্তের ব্যবহার সীমিত হবে।

গবেষণার ফলাফল ব্যাপকতা (Generalizability) এর চেয়ে গভীরতা (Depth) ও প্রাসঙ্গিকতা (Context) অর্জনে বেশি মনোনিবেশ করবে।

২. নমুনা নির্বাচনের সীমা (Limitations in Sampling): বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে, নমুনার আকার সীমিত এবং purposefully নির্বাচিত হবে। তাই, প্রাপ্ত মতামতসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল বিশেষজ্ঞের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে নাও পারে। এটি নির্দিষ্ট কিছু দৃষ্টিভঙ্গির উপর বেশি জোর দেওয়ার কারণে পক্ষপাত (Bias) সৃষ্টি করতে পারে।

খ. বিষয়বস্তুগত ও পরিধি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা (Content and Scope Limitations):

৩. বিষয়ের ব্যাপকতা ও জটিলতা (Vastness and Complexity of the Subject): "বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" এবং "ইসলামী অর্থনীতি" উভয়ই অত্যন্ত বিস্তৃত ও জটিল ক্ষেত্র। একটি একক গবেষণার মধ্যে এই দুটি ব্যবস্থার সকল মাত্রা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করা প্রায় অসম্ভব। তাই, গবেষণাটি কেবলমাত্র সুদ-কেন্দ্রিক মূল সংঘাত এবং এর 'দাসত্ব' ও 'জিহাদ' রূপগুলোর উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পার্শ্ববর্তী বিষয়গুলো (যেমন: মুদ্রানীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি ইত্যাদির বিশদ বিশ্লেষণ) গভীরভাবে আলোচনা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

৪. ইসলামী অর্থনীতির বৈচিত্র্য (Diversity within Islamic Economics): ইসলামী অর্থনীতি একটি একক, সমজাতীয় ব্যবস্থা নয়। বিভিন্ন মাজহাব, চিন্তাধারা ও দেশভেদে ইসলামী অর্থনৈতিক বাস্তবায়নের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। গবেষণাটি সম্ভবত এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যের সকল দিক সমানভাবে কভার করতে সক্ষম হবে না।

গ. তথ্য উৎস সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা (Data Source Limitations):

৫. গৌণ উৎসের উপর নির্ভরশীলতা (Reliance on Secondary Sources): গবেষণার একটি বড় অংশই বিদ্যমান সাহিত্য, বই, জার্নাল নিবন্ধ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনের মতো গৌণ উৎসের উপর নির্ভরশীল হবে। এই উৎসগুলোতে বিদ্যমান তথ্য অসম্পূর্ণ বা নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

৬. প্রামাণিক ইসলামী উৎসের ব্যাখ্যাগত চ্যালেঞ্জ (Interpretive Challenges of Authentic Islamic Sources): কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা (তাফসীর ও শরহ) নিয়ে ইসলামী ইনটেলেকচুয়াল পরম্পরায় বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান। গবেষকীয় সীমাবদ্ধতার কারণে, এই সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে থেকে কেবল সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক ও প্রামাণিকভাবে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকেই এই গবেষণায় প্রাধান্য দেওয়া হবে।

ঘ. প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা (Contextual and Practical Limitations):

৭. গতিশীল ও পরিবর্তনশীল বিষয় (Dynamic and Evolving Subject): বিশ্ব অর্থনীতি এবং ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্র দুটোই দ্রুত গতিতে পরিবর্তনশীল। গবেষণা চলাকালীন সময়ে নতুন অর্থনৈতিক সংকট, নীতি পরিবর্তন বা ইসলামী অর্থসংক্রান্ত নতুন উদ্ভাবন ঘটতে পারে, যা গবেষণাপত্রের অন্তর্ভুক্ত না-ও হতে পারে।

৮. প্রস্তাবিত রূপরেখার বাস্তবায়নগত জটিলতা (Implementation Complexity of the Proposed Framework): গবেষণার শেষ অংশে যে কৌশলগত রূপরেখা বা 'জিহাদ'-এর প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হবে, তা তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমিত থাকবে। রাজনৈতিক ইচ্ছা, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিরোধের মতো বাস্তব বিশ্বের চ্যালেঞ্জের কারণে এই প্রস্তাবনাগুলোর বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব, তার সরাসরি মূল্যায়ন এই গবেষণার বাইরে।

উপসংহার: উপরের সীমাবদ্ধতাসমূহ সত্ত্বেও, এই গবেষণা প্রস্তাবিত পদ্ধতিগত কাঠামোর মধ্যেই যথাসম্ভব কঠোরতা, নিরপেক্ষতা ও গভীরতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। এই সীমাবদ্ধতাগুলোর স্বীকৃতি ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য গবেষণার ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারণ এবং এই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করার পথ সুগম করবে।

অধ্যায় – ২ - ধারণাগত ও ধর্মতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

A Conceptual and Theological analysis of Interest (Riba)

২.১ সুদের সংজ্ঞা

প্রচলিত ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে
সুদের প্রচলিত (সাধারণ) সংজ্ঞা হলো—

নির্দিষ্ট সময় পরে কোনো ধন বা ঋণের উপর অতিরিক্ত যে টাকা দিতে হয়, তাকে সুদ বলে।

আরও সহজভাবে বললে:
কাউকে ১০,০০০ টাকা ধার দিল এবং শর্ত দিল যে ১ মাস পরে ১১,০০০ টাকা ফেরত দেবে— অতিরিক্ত যে ১,০০০ টাকা, সেটাই সুদ।

ইসলামি পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা বিস্তারিত নিম্নরূপ:

১. আভিধানিক অর্থ:
আরবি'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, প্রসারণ, অতিরিক্ত, স্ফীতি বা উৎকর্ষ। যে কোনো প্রকারের অযৌক্তিক বা অন্যায্য বৃদ্ধিকেই রিবা বলা হয়।

২. পরিভাষিক অর্থ:
ইসলামিশরিয়তের পরিভাষায় রিবা বা সুদ বলতে নির্দিষ্ট শ্রেণির বস্তু (সোনা-রূপা ও সেই শ্রেণির খাদ্যবস্তু) বিনিময়ের সময় শর্তসাপেক্ষে আদায়কৃত অতিরিক্ত পরিমাণ অথবা ঋণ দেয়ার সময় শর্তারোপ করে আদায়কৃত অতিরিক্ত মাল-কে বোঝায়।

সুদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

* সুদ একটি নিষিদ্ধ ও কবিরা গুনাহ: কুরআন ও হাদিসে সুদকে চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়েছে এবং এটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

* সুদ শোষণের হাতিয়ার: এটি সম্পদকে কয়েকজনের মধ্যে পুঞ্জীভূত করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।

* সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়েই অভিশপ্ত: রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদ খাওয়া এবং সুদ দেয়া উভয় ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন।

সুদ ও লাভের পার্থক্য:

সুদ হল একটি নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত অতিরিক্ত যা ঋণের উপর আগে থেকে শর্ত করা হয়, ঝুঁকি বা শ্রম ছাড়াই। অন্যদিকে, লাভ হলো বাণিজ্যিক ঝুঁকি গ্রহণ, শ্রম বিনিয়োগ ও মূলধন নিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত অনিশ্চিত আয়। ইসলাম বাণিজ্যকে বৈধ ও উৎসাহিত করেছে কিন্তু সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে।

২.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সুদের ঐতিহাসিক উদ্ভব থেকে বর্তমান পর্যন্ত সুদের বিভিন্ন পর্যায়

২.২.১ সুদের ইতিহাস

সুদ (Interest বা Usury) পৃথিবীর প্রাচীনতম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সুদের প্রচলন মূলত অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি উপায় হিসেবে শুরু হয়, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সভ্যতায় বৈধতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। প্রাচীন ব্যবিলনীয় সভ্যতায় হাম্বুরাবির আইন অনুসারে শস্য ও রৌপ্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করা হতো।

মিশরীয় সভ্যতায় সুদের হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল এবং তা প্রধানত শস্য বা পশু বিনিময়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা হতো।

গ্রিক সভ্যতায় সুদ প্রচলিত থাকলেও দার্শনিক আরিস্টটল এটিকে অপ্রাকৃতিক বলে নিন্দা করেছিলেন।

রোমান সমাজে সুদ নিয়ন্ত্রিত থাকলেও মধ্যযুগে খ্রিষ্টান চার্চ এটিকে নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ করে।

ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ এটি অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক অর্থনীতিতে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত হলেও ইসলামি অর্থনীতি সুদবিহীন বিকল্প ব্যবস্থা যেমন মুদারাবা ও মুশারাকা চালু করেছে।
অতএব, সুদের ইতিহাস মানব সভ্যতার অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তবে এর সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব নিয়ে বিতর্ক বিদ্যমান।

২.২.২ ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় সুদ:
ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৮৯৪-১৭৯৫) বিশ্বের প্রথম লিখিত আইনসংগ্রহের মধ্যে অন্যতম হাম্মুরাবির বিধান (Code of Hammurabi)-তে সুদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাবিলনীয় ব্যবসায়ীরা মূলত শস্য, রূপা ও সোনার বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করত। সুদের হার নির্দিষ্ট ছিল শস্যের ক্ষেত্রে ৩৩% এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে ২০%। অতিরিক্ত সুদ আদায়কে কমানো কখনো অবৈধ ঘোষণা করা হতো, বিশেষ করে ঋণগ্রহীতার ওপর চাপ সৃষ্টি হলে। ব্যবসা ও কৃষিকাজে ঋণ প্রদান করা হতো, এবং ঋণের নিশ্চয়তা হিসেবে সম্পত্তি বন্ধক রাখা হতো। সুদব্যবস্থা অর্থনৈতিক লেনদেন সহজ করলেও, অনেক সময় চরম দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়াত, যা সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। হাম্মুরাবির বিধান (Hammurabi's Code) এ, যা খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ সালের কাছাকাছি সময়কার। এই বিধানে ঋণের সুদের হার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং সুদখোরদের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

২.২.৩ মিশরীয় সভ্যতায় সুদ:
প্রাচীন মিশরে (খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০০-৩০০) সুদের প্রচলন ছিল, তবে এটি ছিল কিছুটা সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত। মিশরীয়রা মূলত শস্য ও পশুর বিনিময়েসুদ হিসেবে করত, কারণ খাত খুব সামান্য তখনও ব্যাপকতা হয়নি। ঋণ প্রদানকারীরা কৃষকদের ঋণ দিত, এবং পণ্য উৎপাদনের ভিত্তিতে সুদ নির্ধারিত হতো। মিশরীয় সভ্যতায় সুদব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং কৃষি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হতো। প্রাচীন মিশরীয়রা কৃষি ও ব্যবসার জন্য ঋণ গ্রহণ করত, এবং বিপরীতে চড়া সুদ গুণতে হতো। মিশরীয় প্যাপিরাসে লিপিবদ্ধে সুদসহ ঋণের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২.২.৪ গ্রিক সভ্যতায় সুদ:
প্রাচীন গ্রিস (খ্রিস্টপূর্ব ৮০০-৩০০) অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তবে এটি নৈতিকভাবে বিতর্কিত ছিল। গ্রিক দার্শনিক আরিস্টটল (Aristotle) সুদকে অস্বাভাবিক ও অনৈতিক বলে বিবেচনা করতেন এবং বলতেন যে, "টাকা থেকে টাকা উৎপন্ন

করা অপ্রাকৃতিক”। সুদের হার সাধারণত ১০%-৩২% ছিল, তবে ব্যবসায়িক ঝুঁকির ভিত্তিতে এটি পরিবর্তিত হতো। অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে দাসত্বে পরিণত হতো, যা গ্রিক সমাজের ঋণের একটি নেতিবাচক দিক ছিল। ব্যবহারিক বিকাশ সীমিত হওয়ার পর কিছু গ্রিক শহর-রাষ্ট্র সুদবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছিল। গ্রিক সভ্যতায় সুদ একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়ক হলেও, সামাজিক বৈষম্য ও ঋণদাসত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২.২.৫ ইহুদি ধর্মে সুদের প্রচলন ছিল

ইহুদিরা সেই আদিকাল থেকেই ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল প্রিয় জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ। তারা তাদের শ্বেতপত্র নবীদের বিরুদ্ধে নানা কূটচাল চালতো। তাদের সেসব কূটকৌশলের একটি ছিল সুদ খাওয়ার ব্যাপারে কৌশলের আশ্রয় নেওয়া। অথচ তাদের নবী এ থেকে তাদের বারণ করেছেন এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

فَظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ
الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অর্থ : সুতরাং ইহুদিদের জুলুমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে। আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল।

(সুরা আন- নিসা: ১৬০- ১৬১)

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা ইহুদিদের সুদ খেতে নিষেধ করেন, তারপরও তারা সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকেনি। এজন্য তারা নানা কৌশল গ্রহণ করল। বিষয়টিকে সন্দেহের বাতাবরণে ঢেকে ফেলল আর মানুষের সম্পদ খেতে লাগল অবৈধ পন্থায়।

ইহুদিরা কূট কৌশল দ্বারা সুদ খাওয়াকে জায়েজ করে নেন। কুরআন বলে তার জন্য সুদ নিষিদ্ধ ছিল। আর তাদের বিকৃত ধর্মীয় গ্রন্থ সুদ খাওয়া জায়েজ আছে। সুদের প্রচলন ছিল এবং এটি তাদের ধর্মীয় শাস্ত্রে (বর্তমানে বিকৃত) “তওরাত” (Torah) ও তালমুদ (Talmud) এ উল্লিখিত রয়েছে। ইহুদিদের মাঝে সুদের ব্যবস্থাকে দুইভাবে দেখা হতো—

১. নিজেদের (ইহুদিদের) মধ্যে সুদ হারাম ছিল।

২. অন্য জাতির (অইহুদীদের) প্রতি সুদ গ্রহণ বৈধ ছিল।

২.২.৬ ইসলামের আগের আরবে সুদের প্রচলন—

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজে সুদ (রিবা) ছিল একটি প্রচলিত ও গভীরভাবে প্রোথিত আর্থিক ব্যবস্থা। বাণিজ্যিক লেনদেন, ব্যক্তিগত ঋণ ও সম্পদের বৃদ্ধি লাভের অন্যতম উপায় ছিল সুদ। ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দরিদ্রদের ঋণ দিত এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে মূলধনের সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করত। এভাবে অর্থনীতিতে এক শোষণমূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যেখানে দরিদ্ররা ক্রমাগত ঋণের জালে আবদ্ধ থাকত এবং ধনীরা আরও ধনী হতো। কুরআনে, সুদের এই প্রচলন এবং তার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায়। সেই যুগের প্রচলিত সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কুরআনে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং একে সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.ۚ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদ যা কিছু বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।"
(সুরা আল-বাকারহ: ২৭৮- ২৭৯)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুদ অব্যাহত রাখলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। ইসলামের পূর্বে আরবে সুদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাই ইসলাম এটিকে নির্মূল করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

২.২.৭ রেনেসাঁ ও প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার (১৫০০ - ১৮০০)

· ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার, বিশেষ করে জন ক্যালভিনের শিক্ষা, সুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নরম করে। তিনি যুক্তি দেন যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য ঋণ প্রয়োজনীয়, এবং যুক্তিসঙ্গত হারে সুদ গ্রহণযোগ্য।

· ব্যাংকিংয়ের উত্থান: ইতালিতে (ভেনিস, জেনোয়া) এবং পরে উত্তর ইউরোপে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। এই ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহ করত এবং সেখান থেকে সুদে ঋণ দিত।

· অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ: অ্যাডাম স্মিথ তার "দ্য ওয়েলথ অব নেশনস" (১৭৭৬) গ্রন্থে সুদকে বাজার অর্থনীতির একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি যুক্তি দেন যে সুদ হল মূলধন ব্যবহারের জন্য একটি ভাড়া বা মূল্য।

২.২.৮ বৈশ্বিক সুদের অর্থনীতি (২০শ–বর্তমান)

আধুনিক সুদভিত্তিক ব্যাংকিং:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঋণ বাজার।

বন্ড মার্কেট।

মর্টগেজ।

আন্তর্জাতিক ঋণ
সবকিছু সুদের উপর ভিত্তি করে।

গ্লোবাল ফিনান্স সিস্টেম:

আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আন্তর্জাতিক ঋণ চক্র— সবই সুদ দিয়ে পরিচালিত, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণনির্ভর অর্থনীতির দিকে ঠেলে দিয়ছে।

সুদের বিরুদ্ধে সমালোচনা পুনরুজ্জীবন

২১শ শতকে বিশ্বব্যাপী সমালোচনার কারণ:

ঋণ-দাসত্ব (debt slavery)

বৈষম্য বৃদ্ধি

আর্থিক সংকট (২০০৮ recession)

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা।

২.৩ সুদ : কুরআন ও হাদিসের আলোকে — নৈতিক ব্যাখ্যা

১. কুরআনের আলোকে রিবার নৈতিক ব্যাখ্যা

১.১ আল্লাহর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর ভাষা

কুরআনে সুদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।
আল্লাহ বলেন-

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ পাপাচারী, কুফরকারীকে পছন্দ করেন না।"

সংক্ষিপ্ত তাফসীর/ব্যাখ্যা:

১. "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন":

· এখানে 'মাহক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ ধ্বংস করা, নিশ্চিহ্ন করা বা বরকত উঠিয়ে নেওয়া। সুদভিত্তিক সম্পদ দেখতে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হলেও এর মধ্যে প্রকৃত বরকত থাকে না। আল্লাহ তাআলা সুদের সম্পদ ধ্বংস করেন—হয় সরাসরি তা কমিয়ে দিয়ে, নয়তো তার বরকত উঠিয়ে নিয়ে, যাতে চূড়ান্তভাবে তা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

২. "এবং সাদকাকে বর্ধিত করেন":

· সদকা বা দান-খয়রাতের বিপরীত চিত্র। বাহ্যিকভাবে দেখতে কমে যাচ্ছে বলে মনে হলেও আল্লাহ তাআলা তা বহুগুণে বৃদ্ধি করেন—দুনিয়ায়ই সম্মান, রিজিকে বরকত ও পরকালে সওয়াবের মাধ্যমে।

৩. "আর আল্লাহ পাপাচারী, কুফরকারীকে পছন্দ করেন না":

· এখানে 'কাফফার' বলতে অকৃতজ্ঞতাকারী এবং 'আসীম' বলতে পাপাচারীকে বোঝানো হয়েছে। সুদগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী পাপী। তাই আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

প্রাসঙ্গিক শিক্ষা:

· এই আয়াতটি সুদের ভয়াবহ পরিণতি এবং সদকার ফজিলত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে।
· এটি মুমিনদের জন্য একটি শক্তিশালী অনুপ্রেরণা যে, তারা যেন সুদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে এবং সদকা ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে সুদ মানুষের সম্পদকে প্রকৃত অর্থে বরকতহীন করে, আর সমাজকল্যাণমূলক দান ও বিনিয়োগই সম্পদকে ফলপ্রসূ করে।

১.২ সুদকে শোষণ ও অন্যায়ের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ

সুদ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে মূলধনের মালিক নিশ্চিত লাভ পায়, কিন্তু ঋণগ্রহীতা ঝুঁকির সমস্ত বোঝা বহন করে।
এটি নৈতিকভাবে অন্যায় ও শোষণমূলক।
কুরআন এই বৈষম্যকে “ধনী–দরিদ্র বিভাজনের উৎস” হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

১.৩ সুদগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ঘোষণা

সবচেয়ে কঠোর আয়াতে বলা হয়েছে—

"যদি তোমরা সুদ ত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা শোনো।" (২:২৭৯)

এখনো পর্যন্ত কুরআনে কোনো অন্য গুনাহর ক্ষেত্রে এ ধরনের যুদ্ধ ঘোষণার হুঁশিয়ারি নেই। এটি সুদের ভয়াবহ নৈতিক প্রভাবের প্রতিফলন।

২. হাদিসের আলোকে রিবার নৈতিক ব্যাখ্যা

২.১ রিবার সব ধরণকে গুনাহ হিসেবে উল্লেখ

রাসুল ﷺ বলেছেন—
"সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদলেখক এবং সুদ লেনদেনে সাক্ষী— সবাই সমানভাবে গুনাহে জড়িত।"
(সহিহ মুসলিম)

এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে সুদ সামাজিক সম্পর্ক, লেনদেন ও আস্থা— সবকিছুকেই নষ্ট করে।

২.২ শোষণ ও অসাম্য রিবার মূল ক্ষতি

হাদিসে বলা আছে—
"কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে সুদ আদায় করে, আল্লাহ তার বরকত নষ্ট করে দেন।"
(ইবনে মাজাহ)

এটি নৈতিকভাবে দেখায়— দরিদ্রের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে লাভ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

২.৪ কুরআন ও হাদিসে সুদ (রিবার) নিষেধাজ্ঞা (হারাম হওয়া)

১। কুরআনে সুদের অবৈধতা ও শাস্তি:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) দণ্ডায়মান হবে সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মাতাল বা অস্থির করে দেয়। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'ব্যবসা তো সুদেরই মতো!' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তারই। আর তার (অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় (সুদ গ্রহণ) করল, এরূপ লোক জাহান্নামী হবে। তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে।"
(সুরা বাকারহ- ২৭৫)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:
সুদখোরের ভয়াবহ পরিণতি: আয়াতে সুদখোরদের কিয়ামতের দিনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তারা এমনভাবে কবর থেকে উঠবে বা হাশরের ময়দানে দাঁড়াবে, যেমন শয়তানের স্পর্শে কেউ পাগল বা বেহুশ হয়ে গেছে। তাদের হাঁটা-চলা ও মানসিক অবস্থা অত্যন্ত অস্থির ও বিশৃঙ্খল হবে। এর মাধ্যমে দুনিয়াতে সুদের মাধ্যমে যারা অন্যের সম্পদ গ্রাস করে, তাদের মানসিক ও নৈতিক অস্থিরতা এবং আখেরাতে তাদের চূড়ান্ত বিপর্যয়কে তুলে ধরা হয়েছে।

সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য: তৎকালীন সময়ের সুদখোররা সুদকে ব্যবসার মতোই মনে করত। এই আয়াতে তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণার জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) হালাল, আর সুদ (রিবা) হারাম। ব্যবসার মধ্যে লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি

থাকে এবং এতে সমাজের উপকার হয়, কিন্তু সুদে কোনো ঝুঁকি নেই, এতে কেবল অর্থ ঋণদাতার কাছেই জমা হয় এবং সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

তাওবা ও প্রত্যাবর্তনের সুযোগ: আল্লাহ বলছেন, যদি কোনো ব্যক্তির কাছে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সুদের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত উপদেশ (কুরআনের আয়াত) পৌঁছানোর পর সে বিরত হয়, তবে পূর্বে সে যা করেছে তার জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন (আল্লাহর এখতিয়ারে)। এটি তাওবা বা তওবার দরজা খোলা থাকার ইঙ্গিত।

পুনরাবৃত্তি এবং চিরস্থায়ী শাস্তি: কিন্তু যারা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার পরেও আবার সুদের কারবারে ফিরে যাবে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটি সুদের ভয়াবহতা ও তা থেকে দূরে থাকার চূড়ান্ত সতর্কবার্তা।

তিনি আরো বলেন,

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদাকাহকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ, পাপীকে ভালোবাসেন না।"
(সুরা বাকারহ- ২৭৬)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
সুদের পরিণতি (ধ্বংস): আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন (ইয়ামহাকু) করে দেন। এর অর্থ সুদের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ আপাতদৃষ্টিতে বেশি মনে হলেও তা থেকে বরকত দূর হয়ে যায়। হয়তো সে সম্পদ নানাভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অথবা সেই সম্পদের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, অথবা এর ফলে সৃষ্ট পাপের কারণে আখেরাতে সেই ব্যক্তির ধ্বংস নিশ্চিত হয়। সুদখোরদের সম্পদ কখনোই স্থায়ী সুখ বা শান্তি এনে দিতে পারে না।

সাদাকার প্রতিদান (বৃদ্ধি): অপরদিকে, আল্লাহ সাদাকাহ (দান-খয়রাত)-কে বাড়িয়ে দেন (ইউরবি)। এখানে বৃদ্ধি বলতে শুধুমাত্র আখেরাতে পুরস্কারের বহুগুণ বৃদ্ধি বোঝানো হয়নি, বরং দুনিয়াতেও এই সম্পদের বরকত, বৃদ্ধি এবং এর দ্বারা মানুষের মন ও সমাজের কল্যাণ

বোঝানো হয়েছে। দান করা সত্ত্বেও আল্লাহ দাতার সম্পদে তার চেয়েও বেশি বরকত দান করেন।
আল্লাহর অপছন্দ: আয়াতে শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অকৃতজ্ঞ (কাফফার) ও পাপী (আছিম) ব্যক্তিকে ভালোবাসেন না।

অকৃতজ্ঞ (কাফফার): যারা আল্লাহর দেওয়া হালাল উপার্জনের সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ না করে হারাম সুদ গ্রহণ করে, তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
পাপী (আছিম): সুদ গ্রহণ করা একটি মারাত্মক মহাপাপ।
তাই সুদখোররা একই সাথে অকৃতজ্ঞ ও পাপী হিসেবে আল্লাহর অপছন্দের পাত্র হয়।

আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারহতে আরো ইরশাদ করেন,
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা ছেড়ে দাও— যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।"
(সুরা বাকারহ: ২৭৮)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:
মুমিনদের প্রতি সরাসরি আহ্বান: এই আয়াতটি সরাসরি ঈমানদারদের (মুমিনদের) উদ্দেশ্য করে একটি কঠোর নির্দেশ। 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করার অর্থ হলো—ঈমানের দাবিদার হলে অবশ্যই এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে।
আল্লাহর ভয় ও সতর্কতা: প্রথম নির্দেশ হলো "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (আত্তাকুল্লা-হ)"। সুদ একটি মহাপাপ, তাই মুমিনদের উচিত আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এই কাজ থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা।

অবশিষ্ট সুদ বর্জন: দ্বিতীয় ও মূল নির্দেশ হলো "সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা ছেড়ে দাও"। অর্থাৎ, এই আয়াত নাযিলের আগে যদি কারও কাছে সুদের পাওনা বাকি থাকে, তবে সেই পাওনা ছেড়ে দিতে হবে, অর্থাৎ মূলধন ছাড়া অতিরিক্ত কোনো কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। এই নির্দেশ মদিনার ইহুদি ব্যবসায়ী এবং মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান সুদের লেনদেনকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার জন্য ছিল।

ঈমানের শর্ত: আল্লাহ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন—"যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো"। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সুদের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ করা হলো ঈমানের একটি অপরিহার্য দাবি। যারা এই নির্দেশ মানবে না, তাদের ঈমানের দাবি নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

এই আয়াতটি সুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং পরবর্তী আয়াত (২৭৯) এই নির্দেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলেছে।

২৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

"অতঃপর যদি তোমরা (সুদ বর্জন) না কর, তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা (কারও প্রতি) যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।"

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:
আল্লাহ্‌ ও রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা: এটি কুরআনে বর্ণিত সবচেয়ে কঠোর সতর্কবাণীগুলোর মধ্যে একটি। আল্লাহ বলছেন, যদি কেউ সুদের লেনদেন চালিয়ে যায় এবং পূর্বের আয়াতের নির্দেশ (অবশিষ্ট সুদ ছেড়ে দেওয়া) অমান্য করে, তবে সে যেন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এই ঘোষণা সুদের পাপের ভয়াবহতা ও গুরুত্বকে চূড়ান্তভাবে তুলে ধরে। এই 'যুদ্ধ' বলতে আখেরাতের কঠোর শাস্তি, দুনিয়াতে বরকত বিলুপ্তি এবং ইসলামিক সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকেও বোঝায়।

তাওবা ও মূলধন ফেরত: যদি কেউ এই নির্দেশ মেনে নেয় এবং সুদ থেকে তাওবা (ফিরে আসে) করে, তবে তার জন্য সমাধান হলো: "তোমরা তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে।" অর্থাৎ, সুদের চুক্তি বাতিল হবে এবং ঋণগ্রহীতা কেবল ঋণের আসল টাকা (মূলধন) ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: আয়াতের শেষাংশ সুদের বিধানের মূলনীতিকে স্পষ্ট করে: "তোমরা (কারও প্রতি) যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।"
মূলধনের অতিরিক্ত (সুদ) নিলে, ঋণগ্রহীতার প্রতি যুলুম করা হয়।

মূলধন ফেরত না পেলে, পাওনাদারের প্রতি যুলুম করা হয়।
ইসলামী অর্থনীতিতে এই আয়াতটি সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত লেনদেন এবং ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

এছাড়াও সুদের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তিনি আরো বলেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
"হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।"
(সুরা আলে ইমরান: ১৩০)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
এই আয়াতটি ইসলামী শরীয়তের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, যা সুদ (রিবা)-কে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সুদ বর্জন: আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন চক্রবৃদ্ধিহারে বা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ না খায়।
যদিও আয়াতে "চক্রবৃদ্ধি হারে" কথাটি এসেছে, অধিকাংশ আলেম ও তাফসীরবিদদের মতে, কোরআনের অন্যান্য আয়াত (যেমন সূরা বাক্কারার ২৭৫-২৮১) এবং সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে সকল প্রকার সুদই সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ, তা কম হোক বা বেশি। এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো - সেই সময়ের (জাহেলিয়াতের) সুদের ভয়াবহ রূপ, যেখানে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদের উপর সুদ চাপিয়ে মূলধন কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হতো, তার থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা।

তাকওয়া অবলম্বন: সুদের মতো অন্যায় উপার্জন থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি আল্লাহকে ভয় করার (তাকওয়া) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সফলতার পথ: আল্লাহকে ভয় করে সুদ বর্জন করলে মুমিনদের জন্য ইহকাল ও পরকালে সফলতা (ফলাহ) লাভ করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, এই আয়াতটি সুদকে চিরতরে হারাম করার একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং মুমিনদেরকে তাদের জীবনকে পবিত্র রাখতে ও সফলতা অর্জন করতে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সুরা রূমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُوۡنَ

"তোমরা মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যে সুদ দাও— তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে যে যাকাত দাও, তারাই বহু গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্য।" (সুরা রূম: ৩৯)

সুরা নিসার দুটি আয়াত:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala says:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَا دُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا

"আমি ইয়াহূদীদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তা হারাম করে দিয়েছি তাদের বাড়াবাড়ির কারণে আর বহু লোককে আল্লাহর পথে তাদের বাধা দেয়ার কারণে।" (সুরা আন-নিসা: ১৬০)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala says:

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَ كْلِهِمْ اَمْوَا لَ النَّا سِ بِا لْبَا طِلِ ؕ وَاَ عْتَدْنَـا لِلْـكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَا بًا اَ لِيْمًا

ওয়া আখযিহিমুর রিবা-ওয়া কাদ নুহু 'আনহু ওয়া আকলিহিম আমওয়া-লান্না-ছি বিল বাতিলি ওয়াআ'তাদনা-লিল কা-ফিরীনা মিনহুম 'আযা-বান আলীমা-।

"এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে যদিও তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তাদের অন্যায়ভাবে লোকেদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে এবং আমি তাদের মাঝে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"
(সুরা আন-নিসা: ১৬১)

২. হাদিসের (নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর বাণী ও কর্ম) আলোকে সুদের (রিবা) নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত কঠোরভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামে সুদকে চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদিসের আলোকে সুদের নিষেধাজ্ঞার মূল বিষয়গুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. সুদের সাথে জড়িত সকলের উপর অভিশাপ (লানত)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদের লেনদেনের সাথে জড়িত সকল পক্ষকে সমানভাবে পাপী ও অভিশাপপ্রাপ্ত (লা’নতপ্রাপ্ত) ঘোষণা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. ُ

‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্র হতে বর্ণিতঃ তিনি (‘আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী ও এর দলীল লেখক সবাইকে অভিশম্পাত করেছেন।
(মুসলিম ১৫৯৮; তিরমিযী ১২০৬; আবূ দাউদ ৩৩৩৩; ইব্নু মাজাহ্ ২৩০৭; ইব্নু হিববান ৫০২৫; আহমাদ ৬৩৫, ৬৬০, ৮৪৪, ১১২০, ১২৮৮, ১৩৬৪, ৩৭২৫, ৩৭৩৭, ৩৮০৯, ৪৩২৭, ১৪৩০২)

২. সুদের ভয়াবহতা ও মারাত্মক অপরাধ
হাদিসে সুদকে অত্যন্ত জঘন্য পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা ব্যভিচারের মতো বড় পাপের চেয়েও মারাত্মক।
নিকৃষ্টতম পাপ:
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ: حُوْبًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْـمُسْلِمِ.

''সুদের তিয়াত্তরটি গুনাহ্ রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ্ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজ মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করার সমতুল্য গুনাহ্। আর সবচেয়ে বড় সুদ হলো, কোন মুসলিম ব্যক্তির ইয্যত হনন''।

(ইব্নু মাজাহ্ ২৩০৪, ২৩০৫; হা'কিম : ২/৩৭ সাহীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৫৩৩)

ছত্রিশবার ব্যভিচারের চেয়েও গুরুতর:
আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً.

''সুদের একটি টাকা জেনেশুনে খাওয়া ছত্রিশবার ব্যভিচার চাইতেও মারাত্মক''। (আহমাদ : ৫/২২৫ সাহীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৩৭৫)

৩. সুদের ফলে ধন-সম্পদে বরকতহীনতা
সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে বাহ্যিকভাবে বৃদ্ধি দেখা গেলেও, হাদিস ও কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তাতে কোনো বরকত বা কল্যাণ দেন না।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ.

''সুদ যদিও দেখতে বেশি দেখা যায় তার পরিণতি কিন্তু ঘাটতির দিকেই''। (হা'কিম : ২/৩৭ সাহীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৫৪২; ইব্নু মাজাহ্ ২৩০৯)

৪.পেটের ভেতর সাপ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي النَّهْرَيْنِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَمَرَرْتُ فَوْقَ قَوْمٍ بُطُونِهِمْ كَبُيُوتٍ فِيهَا الْحَيَّاتُ تَرَى مِنْ

خَارِجِ بُطُونِهِمْ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا). (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِه(২০২/৩ -ِ

রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মি'রাজের রাতে যখন আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম, তখন আমি উপরে বজ্র ও বিদ্যুৎ দেখলাম। এরপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের পেট এক একটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত ছিল। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম: এঁরা কারা? তিনি বললেন: এরা সুদখোর।
—(মুসনাদ আহমদ: ২ : ৩৩০)

২.৫ সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগীতা

সুদের অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা কোন রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি কি আর্থিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ সাব্যস্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্ট বস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যে, যাতে কোনো-না-কোনো বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, সিংহ এমনকি সংক্রামক মরণব্যাধি বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোনো-না-কোনো উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশি এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যে সব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশি এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কুরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও পাপের উপকার দুই-ই রয়েছে কিন্তু গোনাহের পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশি।

তাই এ-গুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না; বরং ক্ষতিকর ও বর্জনীয় মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। 'রিবা' অর্থাৎ সুদের ব্যবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদের সাথে সামরিক অবস্থায়ও দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম ও উপকারের তুলনায় অত্যন্ত মারাত্মক। প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোনো বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংনা চিরস্থায়ী হয়, তবে তাকে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোনো বস্তুর উপকার ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোনো সচেতন

মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভালো বলে না।
এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এতে সমূদয়ের সাময়িকক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদের গ্রাস অত্যন্ত ব্যাপক। মানবতার গরিমার ভিতরে থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধু তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার।

কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অনির্দিষ্ট কাল ব্যবহারে শিকার হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা বিচিত্র বটে। এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্টকারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপটে থেকে যায় তা যতই নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই দৃষ্টিপাত করে না, যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়।

প্রথম ও প্রধানত মানব মনের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো, যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় অথবা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুকু? বরং কার্যত সতর্ক করার দরুন যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুবর্তিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না। বর্তমান যুগে সুদ মহামারি আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহুগ্রাসে পতিত। এটি মানষ স্বভাবের রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ তিক্তকে মিষ্টি মনে করতে শুরু করেছে এবং যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোন চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুলে তাকে অপরিণামদর্শী অথবা অবাস্তব চিন্তাধারার লোক বলেই অভিহিত করা হয়। কিংবা যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপাকাকার মহামারি ছড়িয়ে পড়তে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়; বরং সুস্থতা ও সাক্ষাত আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়; বরং মানবতার সাক্ষাৎ শত্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়েও এছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষয়ক্ষতি, অপকার সম্পর্কে অবগত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে। আম্বিয়া আ’লাইহিমুস সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না- তাঁরা এর পরোয়া করেননি। তাঁরা যদি মানুষের মোহ ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মান্যকারী কে ছিল?

সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে; কিন্তু বাস্তব সত্য আজও কোন কোন পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করছেন: তাঁদের মতে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয়; বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটি দুষ্ট ক্ষত যা প্রতিনিয়ত তাকে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও প্রচলনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবাঞ্ছনীয় পরিণতি কী? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও ওসব বিচক্ষণদের দৃষ্টি এড়িয়ে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের অবাঞ্ছনীয় ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং কতক পুঁজিপতি তাদের অর্থ দ্বারা উপকৃত হয় এবং জাতির রক্তশোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়, তখন তারা এক মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদের পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

কিন্তু এই দৃষ্টান্ত এমন, যখন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্য আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেল এবং দেখাল যে, এরা কেমন মোটা-তাজা সতেজ ও সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ। কিন্তু কোন সমঝদার লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে বলবে, তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের বরকত এদের মহল্লায় গিয়ে দেখ। সেখানে দেখতে পাবে শত শত, হাজার হাজার নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত ও মাংসে খেয়েই এ হিংস্ররা লালিত হচ্ছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মেনে নিতে পারে না, যার ফলে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং কিছু সংখ্যক লোক ও তাদের তল্পীবাহকরা স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে।

২.৬ ইসলামী আইনশাস্ত্রে রিবার প্রকারভেদ

সরল সুদ

যখন কোনো ঋণের বিপরীতে প্রতি বছর কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হয়, তাকে সরল সুদ বলে। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক।

ধরি, আবির ১০% সরল সুদে ১০ বছরের জন্য ১ হাজার টাকা ঋণ নিল। প্রতি বছর আবীরের মোট সুদ আসবে ১০০ টাকা। এখন, আবির ২ টা উপায়ে যে-কোনোটা করতে পারে:

ক. প্রতি বছর ১০০ টাকা সুদ এবং মেয়াদ শেষে আসল বা মূলধন ১ হাজার টাকা ফেরত দিবে।

খ. ১০ বছর পরে একবারে সুদ-আসলের মোট ২০০০ টাকা পরিশোধ করে দিতে পারে।

সরল সুদের ক্ষেত্রে আবির যদি ঠিক মতো সুদ না দেয় বা কোনো কিস্তি জমা না দেয়, তাতেও সুদের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

চক্রবৃদ্ধি সুদ

চক্রবৃদ্ধি ব্যবস্থায় সময়মত জমা না দেওয়া সুদের পরিমাণ মূল ঋণ বা আসলের সাথে যুক্ত হয়। এরপর মোট পরিমাণের উপর বর্ধিত সুদ আসে। তাই কিস্তি বিফল গেলে সুদের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে:
ধরি, জরিনা এবার চক্রবৃদ্ধি সুদ ঋণ নিল।
এই অবস্থায়, প্রথম বছরের সুদ জরিনার সুদ আসবে ১০০ টাকা। প্রথম বছরের সুদ সময়মত জমা দিলে, দ্বিতীয় বছর সুদ আসবে ১০০ টাকা। এভাবে প্রতি বছরের পাওনা সুদ জমা দিতে থাকলে জরিনার সুদের পরিমাণ বাড়বে না এবং আসল বা মূল ঋণ ১ হাজার টাকাই থাকবে।

কিন্তু প্রথম বছর সুদ সময়মত পরিশোধ না করলে দ্বিতীয় বছর শেষে সুদ আসবে:
১০০০ টাকার উপর ১ম বছরের সুদ ১০০ টাকা + সময়মত কিস্তি না দেওয়ায় পাওনা ১০০ টাকা সুদের উপর ১০ টাকা সুদ = ১১০ টাকা সুদ।

অর্থাৎ ১ম বছর কিস্তি না দেওয়ায়, ২য় বছরে গিয়ে মূল ঋণ বা আসল হয়ে গিয়েছে ১০০০ + ১০০ = ১১০০ টাকা এবং ২য় বছর শেষে এই ১১০০ টাকার উপর ১০% হিসেবে ১১০ টাকা সুদ এসেছে।
এবার, ২য় বছর শেষে কোনো কিস্তি পরিশোধ না করলে ৩য় বছর শেষে সুদ আসবে:

১১০০ টাকার উপর সুদ ১১০+ ১১০ টাকা সু্দের উপর ১১ টাকা উপরি- সুদ = ১২১ টাকা

অর্থাৎ ২য় বছরেরও কিস্তি না দেওয়ায়, ৩য় বছরে গিয়ে মূল ঋণ বা আসল হয়ে গিয়েছে ১১০০ + ১১০ = ১২১০ টাকা এবং ৩য় বছর শেষে এই ১২১০ টাকার উপর ১০% হিসেবে ১২১ টাকা সুদ এসেছে।
এভাবে, কিস্তি শোধ না করলে প্রতি বছর মোট সুদের পরিমাণ কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কারণ, দেনার সুদ তাঁর মূল ঋণ বা আসলের সাথে যুক্ত হতে থাকবে। এভাবে ১০ বছর পর একবারে সব ঋণ পরিশোধ করতে চাইলে জরিনাকে ১ ম বছরে নেওয়া ১০০০ টাকার বিপরীতে মোট ২,৫৯০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

চক্রবৃদ্ধি সুদ খুব দ্রুত বেড়ে পেয়ে যায়। জরিনা যদি ৩০ বছর পরে একত্রে সব দেনা পরিশোধ করত তাহলে তাকে মোট ১৭,৫০০ টাকা দিতে হতো (অথচ সরল সুদে তা ছিল ৪০০০ টাকা মাত্র)।

শরিয়তের পরিভাষায় রিবা মোট ২ প্রকার।
এক. রিবাল কুরআন বা কুরআনুল কারীম কর্তৃক নিষিদ্ধ রিবা। ইসলামের পরিভাষায় যাকে রিবান্-নাসিয়াহ (Riba an-Naaiyah) বল হয়।

দুই। রিবা সুন্নাহ বা হাদিস কর্তৃক নিষিদ্ধ রিবা।
পরিভাষায় যাকে 'রিবা-উল-বুয়ু' (Riba al-Buyu) বা 'ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত রিবা' (Buying-Selling based Interest) বলা হয়।

প্রখ্যাত ফকিহ ইমাম ইবনে রুশদ আল-হাফিদ রহ. (মৃত-595 হি.) লিখেছেন:

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّبَا يُوجَدُ فِي شَيْئَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَفِيمَا تَقَرَّرَ
فِي الذِّمَّةِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ سَلَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

অর্থ: "সকল আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রিবা মোট দুটি বিষয়ে পাওয়া যায়। এক, ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত বিশেষ লেনদেনে। দুই, বকেয়া মূল্য, ঋণ বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট দায় বা দেনাতে।"

এখানে প্রথম প্রকার হলো ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত রিবা অর্থাৎ রিবাল বুয়ু এবং দ্বিতীয় প্রকারটি হলো ঋণ বা দায়সংক্রান্ত রিবা অর্থাৎ রিবাম-নাসিয়াহ্।

এ দু'টি প্রকারের আবার দুই প্রকার:

রিবাণ নাসিয়াহ্ (Riba an-Nasiyah) এর প্রকারভেদগুলো হলো:

১. ঋণসংক্রান্ত রিবা। একে রিবাল-করজ বা Loan based Interest বলে।

২. দায়সংক্রান্ত রিবা। একে রিবাদ্-দাইন বা 'দায়ভিত্তিক সুদ' বা Sale based Interest বলে।

রিবাল বুয়ু' র প্রকারভেদগুলো হলো:

১. রিবাল ফযল। অর্থাৎ সমজাতীয় ও পরিমাপ্য দুটি বস্তুর লেনদেনে বিনিময়হীন অতিরিক্ত সম্পদ।

২. রিবান নাসা।। দুটি অসমজাতীয় পরিমাপ্য বা ওজনযোগ্য অথবা সমজাতীয় ও পরিমাপ্য দুটি বস্তুর বাকিতে লেনদেন।

রিবাল কর্জ

'কর্জ' শব্দটি আরবী (القرض) (আল-ক্বর্দ)। এর মূল অর্থ হল- 'القطع' কাটা বা কর্তন করা। যেহেতু ঋণদাতা তার সম্পদের একটি অংশ কেটে ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করে থাকে তাই ঋণকে 'ক্বর্দ' (ক্বর্দ/ক্বর্জ/কর্জ) বলা হয়।

রিবাল কর্জে মূল ৩টি বিষয় লক্ষ্য করা হয়:

১. ঋণ-সংক্রান্ত লেনদেন হবে

২. যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেই পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ নেওয়ার জন্য শর্ত দেওয়া হবে

৩. মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আরও অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ নেওয়ার শর্ত দেওয়া হবে

এই রিবা্ূল কর্জকে দু'ভাবে পাওয়া যেতে পারে:
এক.
অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণ দেওয়া।
দুই, ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণের বিনিময়ে কোনো উপকার নেওয়া।

রিবাদ্-দাইন

دين (দাইন) শব্দটির শাব্দিক অর্থ- ঋণ দেওয়া, ঋণ নেওয়া। কারো থেকে কোনো পণ্যের নির্ধারিত বকেয়া মূল্য বা নির্ধারিত ভাড়া বা নির্ধারিত বেতন ইত্যাদি আর্থিক সুনির্দিষ্ট দায় পরিশোধের সময় হলে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে বা মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে অতিরিক্ত প্রদান করাই রিবাদ্-দাইন।
ফকিহগণের আলোচনায় ৩ ধরনের রিবাদ্-দাইনের কথা উঠে এসেছে।
ক. পণ্যের বকেয়া মূল্যে অতিরিক্ত নেওয়া
এই প্রকারের রিবা হলো যে-কোনো পণ্যের নির্দিষ্ট বকেয়া মূল্যের উপর মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত প্রদান করার শর্ত দেওয়া। যেমন:
আলম মিয়া দোকান থেকে সিরাজ ভাই নিয়মিত কেনাকাটা করেন। এই মাসে সিরাজ ভাইয়ের বেতন বাকি পড়ায় সে চুক্তি করল যে, বকেয়া মোট ২ হাজার টাকার সুদই ৩০ দিন পর আলম ভাইকে পরিশোধ করবেন।

কিন্তু পরে আরও সিরাজ ভাইএর বেতন দেরি করা হলো। তাই তিনি আলম ভাইয়ের কাছে আরও ১০ দিন অতিরিক্ত সময় চাইল। আলম ভাই এই অতিরিক্ত ১০ দিনের জন্য ২ হাজারের সাথে আরও ১০০ টাকা অতিরিক্ত দাবি করলেন।

এই অতিরিক্ত সময়ের জন্য চাওয়া অতিরিক্ত ১০০ টাকাটি হচ্ছে রিবাদ্-দাইন, যা হারাম। তাই এমন টাইপের লেনদেন করা যাবে না।

পণ্যের বকেয়া মূল্য ছাড় দেওয়া

পণ্যের নির্দিষ্ট বকেয়া মূল্য তাড়াতাড়ি পরিশোধ করার শর্তে ছাড় প্রদান করা। যেমন: কোনো কোম্পানি ৪ হাজার টাকার ১২টি কিস্তিতে ফ্রিজ বিক্রি করল। কিন্তু মূল চুক্তিতে শর্ত দেওয়া থাকল যে নির্ধারিত সময়ের আগে কিস্তিগুলো দিয়ে দিলে ৫% রেয়াত (ছাড়/ডিসকাউন্ট)

দেওয়া হবে। এই শর্ত দিয়ে যে ছাড় দেওয়া হলো, এটাও রিবাদ্-দাইনের (বড় দাইন) ভিতরে পড়বে।

এ প্রকারের রিবার মৌলিক ৩টি উপাদান হলো:
১. পণ্যের মূল্য সুনির্দিষ্ট হবে
২. মূল্য বকেয়া থাকবে
৩. চুক্তির শুরুতেই বা যখন চুক্তি করা হচ্ছে তখনই বিশেষ শর্তে বকেয়া মূল্য,হ্রাস করার বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আধুনিক জীবনের ফ্রিজ, টিভি, গাড়ি, এসি, মোটর সাইকেলের মতো সামগ্রীর বিক্রেতা কিংবা হাল আমলে ক্রমাগত দাম বাড়তে থাকায় কুরবানির গরুরও যদি কোনো বিক্রেতা এমন শর্তে বিক্রি করে যে, কয়েক কিস্তিতে দাম শোধ করার সুযোগ আছে এবং যদি কিস্তিগুলো আগেই শোধ দিয়ে দেয় তাহলে ৫% ডিসকাউন্ট। চুক্তি শুরুতেই এমন শর্ত যোগ করে দেয়ায় সেই লেনদেন হয়ে যাবে রিবাদ্-দাইনের অন্তর্ভুক্ত, হারাম হয়ে যাবে লেনদেনটি। তাই শুরুতে এমন শর্ত দেওয়া যাবে না।

রিবাল বুয়ু (কেনাবেচা সম্পর্কিত সুদ)
সভ্যতার শুরুতে বর্তমানের মতো ধাতব মুদ্রা বা কাগজের অর্থের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। প্রয়োজনীয় বস্তুর দান-প্রদান হতো দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে। মুদ্রার ইতিহাসে একে বলা হয় 'বিনিময় প্রথা', আরবিতে বলে 'ত্বরিকুল মুকায়াদাহ্' আর ইংরেজিতে বলে 'Barter System'। বর্তমানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে এ-রূপ প্রচলন এখনো চোখে পড়ে। যেমন: পেঁয়াজ দিয়ে পুরাতন কাপড় কেনা হয়। আবার পুরাতন সিলভারের হাঁড়ি-পাতিল দিয়েও নতুন হাঁড়ি-পাতিল বা পেঁয়াজ-রসুন কেনাকাটা করতে দেখা যায়।
তৎকালীন আরবেও এমন কিছু লেনদেনের প্রচলন ছিল। তারা তখন প্রচলিত কিছু দ্রব্য যেমন- গম, যব, খেজুর ইত্যাদি ও সরাসরি স্বর্ণ বা রূপাকে (দিরহাম-দিনার) বিনিময় মাধ্যম (Medium of Exchange) হিসেবে ব্যবহার করত।

জাহেলি যুগে প্রচলিত সকল প্রকার রিবা কুরআনুল কারিম কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এ দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন অনুভব হয়নি। তবে, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। বাজারে প্রচলিত উক্ত লেনদেনটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কারণ, কুরআনুল কারিমে দাইনের বিপরীতে

মেয়াদিয়ার সমজাতীয় মুদ্রার অতিরিক্ত আদান-প্রদানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একে 'রিবা' বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যারা এতে জড়াবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এখন মানুষ যদি এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে বা এক কেজি গমকে দেড় কেজি গমের বিনিময়ে নগদ কেনাবেচায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তাহলে এ চর্চা তাদেরকে মূলত নিষিদ্ধ শর্ত বা দাইনের বিপরীতে সমজাতীয় মুদ্রার অতিরিক্ত প্রয়োগ করে তুলতে পারে। মানুষ বলতে পারে, এক কেজি গমের বিনিময়ে যদি দেড় কেজি গমের লেনদেন করা যায়, তাহলে একশ টাকা বা ঋণের বিপরীতে একশ পাঁচ টাকার লেনদেনও করা যাবে। কারণ, দুটি ক্ষেত্রেই সমজাতীয় বস্তুর পারস্পরিক লেনদেনে অতিরিক্ত বিনিময় হচ্ছে। অথচ এটি স্পষ্ট রিবাদ্-নাসিয়াহ্। যা কুরআনুল কারিমে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।
একটি হাদিস দ্বারা ব্যাপারটি পরিষ্কার করে নেয়া যাক। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"তোমরা (নগদে) এক দিনার দুই দিনারের বিনিময়ে, এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে এক সা' দুই সা'র বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় কর না। কেননা আমি তোমাদের উপর রিবা ভয় করি।"
(ইমাম আহমদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, মৃত-২৪১ হি., মুসনাদে আহমদ, মুয়াসসাতুর রিসালা, হাদীস নং-৬৪৮৫, খ.১০ পৃ.২২৪)।

নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিবা বা সুদ নিষিদ্ধ করে যে ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন। উবাদা বিন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"স্বর্ণের সাথে স্বর্ণের লেনদেন সমান হবে, রূপার সাথে রূপার লেনদেন সমান হবে, খেজুরের সাথে খেজুরের লেনদেন সমান হবে, গমের সাথে গমের লেনদেন সমান হবে, লবণের সাথে লবণের লেনদেন সমান হবে, যবের সাথে যবের লেনদেন সমান হবে। উভয় দিকে সমান লেনদেন না করে যে কোনো একদিকে বৃদ্ধি করা হলে সেটা রিবা হবে। আর স্বর্ণের সাথে রূপার লেনদেন কম-বেশি করে যেভাবে খুশি সেভাবে করতে পার। তবে নগদে হতে হবে। তেমনি খেজুরের সাথে গমের লেনদেন যেভাবে খুশি কম-বেশি করতে পার। তবে নগদে

হতে হবে। অনুরূপ খেজুরের সাথে যবের লেনদেন যেভাবে খুশি কম-বেশি করে কর। তবে নগদে হতে হবে।"
(ইমাম তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা সাওরাহ্, মৃত-২৭৯ হি. সুন্নাতু তিরমিযি, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, দ্বিতীয় এডিশন-২০০৬ খৃ. হাদীস নং-১২৪০, পৃ.২৫২)।

রিবাল বুয়ু' বা কেনাবেচা সম্পর্কিত সুদ দুই প্রকার। যথা:
১. রিবাল ফযল
২. রিবান্ নাসা

রিবাল ফযল

ফযল শব্দটার অর্থ হলো 'কোনো কিছু অতিরিক্ত হওয়া'। প্রখ্যাত ফকীহ্ আলাউদ্দিন আল-কাসানী (রহ.) বলেছেন,

"রিবাউল-ফযল হলো বিক্রয় চুক্তিতে কোনো এক পক্ষ সম্পদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্ত করা বা শরীয়তের মানদন্ডে অতিরিক্তি বলে গণ্য হওয়া।"

সমজাতীয় বস্তু যেমন- ধানের সাথে ধান, ময়দার সাথে ময়দা, তেলের সাথে তেল কিংবা মুড়ির সাথে মুড়ি ইত্যাদির সাথে লেনদেন বা বিনিময়ের সময় কম-বেশি করে লেনদেন করাটাই হলো রিবাল ফযল।

অর্থাৎ, সমজাতীয় বস্তু লেনদেনের ক্ষেত্রে:
ক. উভয়দিকে সমান সমান হতে হবে। কম-বেশি করা যাবে না।
খ. উভয়টি নগদ হতে হবে। কোনো একটিও বাকি রাখা যাবে না।
যেমন: রহিম ব্যাপারীর কাছে ২০০ কেজি আজওয়া খেজুর আছে। সে ১০০ কেজি আজওয়া খেজুরের বিনিময়ে ২০০ কেজি মরিয়ম খেজুর নিতে চায়। এখন যেহেতু খেজুর একজাতীয় বস্তু, তাই ২০০ কেজির বিনিময়ে ২০০ কেজিই নিতে হবে। কম-বেশি করা যাবে না। আর বাকিতেও এই লেনদেন করা যাবে না।
কিন্তু আজওয়া খেজুর তো মরিয়ম খেজুরের অপেক্ষা বেশি মূল্যবান। এই ক্ষেত্রে সমান সমান লেনদেন কীভাবে হবে? এই সমস্যার চমৎকার একটা সমাধান রাসূল (সা.) নিজেই দিয়ে গিয়েছেন।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে খেজুর ব্যবহারের সরকারি বিশেষ কাজে নিযুক্ত করলেন। একদিন সে ব্যবহারের চেয়ে ভালো মানের কিছু খেজুর নিয়ে আসল। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন, "খায়বরের সব খেজুর কি এরকম?"
লোকটি জবাবে বলল, "না, মূল বিষয়টা হলো, ভালো মানের এক সা’ (১ সা’ খেজুরের ৩ কেজি ২৭৪ গ্রাম প্রায়) খেজুর ক্রয় করি নিম্ন মানের দুই সা’ খেজুরের বিনিময়ে। আর দুই সা’ ভালো মানের খেজুর ক্রয় করি নিম্ন মানের তিন সা’ খেজুরের বিনিময়ে।"
নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শুনে বললেন, "তোমরা এমনটি করবে না। বরং প্রথমে তোমাদের নিকট সংরক্ষিত খেজুর দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করবে। এরপর ঐ দিরহাম দিয়ে ভালো মানের খেজুর ক্রয় করবে।"

- বুখারী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, (১৮৪/হি.-২৫৬/হি.), আল-জামি‘উস সহীহ (সহীহ বুখারী) কায়রো, দারুল হাদীস, 'কিতাবুল বুয়ু', 'বাবু ইযা আরাদা বাই'আ ' 'তামারিন বিতামারিন খিরিন মিনহ্', হাদীস নং ২২০১, ২২০২।

এর মানে হলো, করীম ব্যবসায়ী তাঁর ২০০ কেজি আজওয়া খেজুর ১ হাজার টাকা দরে ২ লাখ টাকায় রহিম ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিলেন এবং এরপর রহিম ব্যবসায়ীর কাছে থেকে ৭০০ টাকা কেজি দরে ৩০০ কেজি মরিয়ম খেজুর ২ লাখ ১০ হাজার টাকায় কিনে নিলেন।

সুতরাং এই হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিবাল ফযল থেকে বেঁচে থাকার অত্যন্ত সহজ একটি পথ বাতলে দিলেন আমাদেরকে, আলহামদুলিল্লাহ।

উপরে উল্লিখিত বিখ্যাত হাদীসটিতে, যেখানে রিবাল বুয়ু নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে মাত্র ছয়টি জিনিসের বিশেষ লেনদেনকে নিষেধ করা হয়েছে। একনজরে ৬টি জিনিস হলো:
১. স্বর্ণ (Gold)
২. রুপা (Silver)
৩. গম (Wheat)
৪. যব (Barley)
৫. খেজুর (Dates)
৬. লবণ (Salt)

এই হাদীসে মৌলিকভাবে দুটি বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে।

যথা:

১. এক, ছয়টি বস্তুর পরস্পর লেনদেন সমান সমান করে করতে হবে। কম-বেশি করা যাবে না। হাদীসে ‘মিছলান' 'বিমিছলিন', 'সাওয়াআন' 'বিসাওয়ায়িন', 'ইয়াদান' 'বিইয়াদিন' এই তিনটি শব্দ এসেছে। এর অর্থ হলো এখানে সমতা তিন দিক থেকে হবে। যথা:

১. জাতীয়তায় এক হওয়া।

২. পরিমাণ বা ওজনে সমান হওয়া।

এই তিন দিক থেকে সমতা পাওয়া গেলে লেনদেন সমান সমান করে করতে হবে। অন্যথায় তা ‘রিবা’ হবে। পরিভাষায় এই রিবাতে ‘রিবাল ফযল’ (Riba Due to Excess) বলে।

দুই. হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে-

"...অতঃপর যখন এগুলো জাত ও প্রকারে ভিন্ন হবে তখন তোমরা কম-বেশি করে যেভাবে খুশি সেভাবে লেনদেন করতে পার। তবে নগদে হতে হবে”

এর মাধ্যমে বোঝা গেল, এই ৬ বস্তুর একপ্রকার অন্য প্রকারের সাথে লেনদেন করা হলে কম-বেশি করে কেনাবেচা করা যাবে। তবে তা নগদে হতে হবে। বাকিতে হলে তা রিবা বলে গণ্য হবে। এই রিবাতে পরিভাষায় ‘রিবান নাসা’ (Riba Due to Deferment) বলে। অর্থাৎ দুটি অসমজাতীয় পরিমাপীয় বা ওজনেযোগ্য অথবা সমজাতীয় ও পরিমাপীয় দুটি বস্তুর বাকিতে লেনদেন হলো রিবান নাসা।

আমরা জানলাম, হাদীসে কেবল ৬টি দ্রব্যে 'রিবাল বুয়ু' নিষেধ করা হয়েছে। অথচ আমাদের সমাজে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য এবং মুদ্রা হিসেবে গ্রহণযোগ্য বস্তু ঐ ৬টি থেকে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ ধান এবং তামা (Copper) আমাদের নিত্য ব্যবহৃত বেচাকেনার পণ্য। আবার, এই ধান কিংবা তামা চাইতেলে মুদ্রার মতো ব্যবহার করা সম্ভব। এমনকি কম-বেশি করে সুদের মতো লেনদেন করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন হলো, এ সময়ে বহুল ব্যবহৃত দ্রব্যের রিবাল বুয়ুর বিধান আমাদের সমাজে উপর প্রয়োগ হবে কি না? কারণ, হলে কীভাবে হবে?

এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, হ্যাঁ, প্রয়োগ হবে। শুধু আমাদের সমাজে না বরং সকল সমাজেই কেয়ামত পর্যন্ত প্রয়োগ হবে। তবে কিভাবে হবে, এর উত্তর দিচ্ছি ইসলামি পরিভাষায় 'তাখরিজুল মানাত' বা ইংরেজিতে Externalization । ফকিহগণ ইজতিহাদ করে উপরের ৬টি দ্রব্যের 2টি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের (Common Characteristics) বের

করেছেন এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য যেসকল দ্রব্যে পাওয়া যাবে, সেগুলোতেও একই বিধান কার্যকর হবে। আর 2টি বৈশিষ্ট্য হলো:

১. ওজন বা পাত্রে পরিমাপ করা যায় এমন হওয়া (আরবিতে বলে 'ক্বদর' এবং ইংরেজিতে বলে Weight/Volume)।

২. সমজাতীয় হওয়া (আরবিতে বলে 'জিনস' এবং ইংরেজিতে বলে Similar Commodities)

এটি ইবরাহীম নাখাঈ রহ., ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ., ইমাম যুহরী রহ., ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর প্রসিদ্ধ মতামত। তাঁরা বলতে চান, হাদীসে বর্ণিত ছয়টি জিনিসের মধ্যে উক্ত 'জিনস' ও 'ক্বদর' আছে। এতে অনুমীত হয়, এ দুটি গুণ অন্য যেসব বস্তুতে থাকবে তাতেও রিবাল বুয়ুর বিধান প্রয়োগ হবে।
সুতরাং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী প্রত্যেক পরিমেয় বস্তুকে তার সমজাতীয় বস্তুর সাথে লেনদেন কম-বেশি করলে তাতে রিবাল বুয়ু সংঘটিত হবে। সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু হোক। যেমন: গমের সাথে গমের লেনদেন কিংবা পিতলের সাথে পিতলের লেনদেন কম-বেশি করলে রিবা বা রিবাল ফযল হবে।

এই ইজতিহাদের আলোকে বলা যায় যে, কেনাবেচার মোট তিনটি ধরন হতে পারে:
এক. উক্ত দুটি গুণ তথা সমজাতীয়তা ও পরিমেয় একসাথে পাওয়া যাবে।

যেমন: ভুট্টার সাথে ভুট্টার লেনদেন। এক্ষেত্রে কম-বেশি করা যেমন নিষেধ, তেমনি বাকি লেনদেনও নিষেধ।

দুই. দুটি গুণের যে-কোনো একটি পাওয়া যাবে।
ক. পরিমাপ করা যায়, কিন্তু সমজাতীয় না।
যেমন: চাউলের সাথে গমের লেনদেন, মাছের সাথে মাংসের লেনদেন কিংবা পানির সাথে তৈলের লেনদেন।

খ. সমজাতীয়, কিন্তু পরিমাপ করা যায় না।
যেমন: একটি ছাগলের বিনিময়ে দুটি ছাগলের লেনদেন। উভয় ক্ষেত্রে কম-বেশি করে লেনদেন করা বৈধ। তবে বাকি লেনদেন নিষিদ্ধ। এরকমভাবে একটি চাকুর সাথে দুটি চাকুর লেনদেন, একটি মোবাইল দিয়ে দুটি মোবাইল কেনা, একটি বই দিয়ে দুটি বই কেনা বৈধ। কিন্তু এই ধরনের লেনদেন বাকিতে করা নিষিদ্ধ।

তিন. দুটি গুণের কোনটি থাকবে না, অর্থাৎ সমজাতীয় হবে না এবং পরিমাপ করাও যাবে না।

যেমন: দুটি ডিম দিয়ে একটি আপেলের লেনদেন। এক্ষেত্রে যেমন কম-বেশি করা বৈধ, তেমনি কোনো একটা পণ্য বাকি রাখাও বৈধ। তদ্রূপ একই কোম্পানির একটি মোবাইল দিয়ে অন্য কোম্পানির দুটি মোবাইল ক্রয় করা নগদেও বৈধ, বাকিতেও বৈধ। তেমনিভাবে একই বই ভিন্ন লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত এবং দুটি প্রকাশনার মধ্যে ছাপানোর মান, কাগজের মান, সম্পাদনার মান ইত্যাদি দিক থেকে পার্থক্য আছে। তাহলে এক্ষেত্রে দুটি প্রকাশনা ভিন্ন জাতীয় বলে গণ্য হবে। সে হিসাবে কম-বেশি যেমন বৈধ হবে, বাকিও বৈধ হবে।

রিবাল ফযলের উদাহরণ

সমজাতীয় মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে
মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় মুদ্রা যদি একই জাতীয় ও শ্রেণিভুক্ত হয়, তাহলে লেনদেন সমান সমান হতে হবে এবং উভয়পক্ষের হস্তগত হতে হবে।

এজন্য পুরানো নোট বা অতিরিক্ত টাকার অসম লেনদেন হারাম। ঈদের মৌসুমে মানুষজন 'সালামী' দেয়ার জন্য নতুন নোট কেনে, যেখানে পুরানো ১০৫/১১০ টাকার বিনিময়ে নতুন ১০০ টাকার নোট কেনাবেচা হয়। এই ব্যবসা হারাম।

কিন্তু দুইটি ভিন্ন নোট যেমন ডলারের বিনিময়ে টাকা বা রূপির বিনিময়ে ইউরো ইত্যাদির লেনদেন করা যাবে।

রিবান-নাসা

'আন-নাসা' শব্দটার অর্থ হলো বিলম্বিত করা, দেরি করানো; দূরে রাখা, পিছিয়ে দেওয়া। যেহেতু এই রিবা বাকিতে লেনদেন করার কারণে পাওয়া যায় তাই একে রিবান্-নাসা বলা হয়।

রিবা-নাসার কিছু উদাহরণ

আলু ও পেয়ারার বিনিময়

কবির মোল্লার মাঠে এবার অনেক আলু হয়েছে। এবার সে মাঠ থেকে আলু তোলায় ব্যস্ত। দুপুরে জিরানোর সময় সে দেখল তবারক মুনশি গাড়িতে করে তার পেয়ারা বাগানের পেয়ারা বেচতে নিয়ে যাচ্ছে। কবির মোল্লা তবারক মুনশির কাছে ২ মন পেয়ারা চাইল। ভালো ফলনের খুশিতে আশপাশের সবাইকে কবির মোল্লা পেয়ারা খাওয়াবে। কিন্তু ঝামেলা হলো, কবির মোল্লা এখনো আলু বিক্রি করে টাকা হাতে পায়নি, তাই সে টাকা দিতে পারছে না। তাই কবির মোল্লা আজকের বাজারদর অনুযায়ী ২ মন পেয়ারার কাছাকাছি দামের ৩ মন আলু নিয়ে যেতে বলল। তবারক মুনশির জন্য ২ মন পেয়ারার বিনিময়ে ৩ মন আলু এখনি বাসায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। তবে, তবারক মুনশি এখন পেয়ারা দিয়ে যাবে আর পরের দিন এসে আলু নিয়ে যাবে। মাত্র ১ দিনের ব্যবধানে বাকিতে এই লেনদেন কি জায়েজ?

অবশ্যই না। ২ মন পেয়ারার সাথে ৩ মন আলুর লেনদেন বৈধ, দামে সমান না হলেও বৈধ, কিন্তু সেটা হতে হবে নগদে। বাকিতে লেনদেন হলেই সেটা হবে রিবান-নাসা।

চালের বদলে ডাল

৫ কেজি চালের বিনিময়ে কেউ ২৫ কেজি ডাল কিনতে চাইলে লেনদেন হতে হবে নগদে। খেয়াল করে দেখুন, আজকে ২ কেজি চালের দাম ১ কেজি ডালের সমান হতে পারে। কিন্তু বাকিতে ১ কেজি ডালের বিনিময়ে ২ কেজি চাল বিক্রি করার পর যদি দাম বেড়ে যায় বা কমে যায়, তাহলে? এই বাড়া বা কমার ফলে, ডাল পরিশোধের সময় কোনো এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হতেই পারে। তবে, টাকা বা যে-কোনো মুদ্রা দিয়ে কেনাকাটা করার ক্ষেত্রে বাকিতে লেনদেন করা জায়েজ আছে।

২.৭ সমসাময়িক গবেষণায় সুদ ও বৈষম্যের সম্পর্ক

সমসাময়িক গবেষণায় সুদ (রিবা) ও বৈষম্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কের বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো:

অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে সুদের প্রভাব

১. ধনবৈষম্য বৃদ্ধি

· সম্পদ পুঞ্জীভবন: সুদের মাধ্যমে সম্পদ সীমিত সংখ্যক ধনী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়

· দরিদ্রদের উপর চাপ: নিম্ন আয়ের মানুষ উচ্চ সুদের হারে ঋণ নিয়ে আরও দরিদ্র হয়।

· ডেব্ট ট্র্যাপ: সুদভিত্তিক ঋণ দরিদ্র দেশগুলো এবং individuals কে debt trap-এ ফেলে।

২. আঞ্চলিক বৈষম্য

· উন্নয়নশীল দেশসমূহ: IMF ও World Bank-এর সুদভিত্তিক ঋণ developing countries-কে financial dependency-তে রাখে।

· উদাহরণ: ১৯৮০-৯০ এর দশকের ল্যাটিন আমেরিকান debt crisis.

সামাজিক বৈষম্য

১. শ্রেণী বিভাজন

সুদ ব্যবস্থার প্রভাব:
- Lender শ্রেণী → সম্পদ বৃদ্ধি
- Borrower শ্রেণী → দারিদ্র্য বৃদ্ধি

২. প্রজন্মগত বৈষম্য

· ঋণের বোঝা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর চাপানো
· Student loan crisis (যুক্তরাষ্ট্রে $1.7 ট্রিলিয়ন)

আন্তর্জাতিক বৈষম্য

১. উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন

· উন্নত দেশগুলি সুদ আয়ের মাধ্যমে developing countries-এর সম্পদ শোষণ করে।
· Odious debt সমস্যা।

২. বাণিজ্য অসমতা

· সুদভিত্তিক financing global trade imbalance বাড়ায়।

সমসাময়িক গবেষণা সুন্নাহর বাণীকে সমর্থন করে যে "সুদ সম্পদ বৃদ্ধি করে না" (সূরা রুম ৩৯)।
বৈশ্বিক গবেষণা নির্দেশ করে যে সুদভিত্তিক অর্থনীতি structural inequality তৈরি করে, যদিও ইসলামী finance model বৈষম্য কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে আরও empirical research প্রয়োজন।

অধ্যায় – ৩ - বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা(Global Economic System)

৩.১ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৩.১.১ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা : CAPITALIST ECONOMIC SYSTEM

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা:

পুঁজিবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার উপার্জিত সম্পদের সম্পূর্ণ মালিক এবং তা ইচ্ছেমতো ব্যবহার, সংরক্ষণ বা বিনিয়োগ করতে স্বাধীন। এই ব্যবস্থায় মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, যেখানে সম্পদ আহরণের উপায়-উপকরণ একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে সমাজে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে ধনী ও দরিদ্র। ধনীরা সম্পদ কুক্ষিগত করে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করে, আর দরিদ্ররা অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা শ্রমিক শ্রেণিতে আবদ্ধ থেকে কষ্টকর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাংক, বিমা, শেয়ারবাজার, লিমিটেড কোম্পানি ও সুসংগঠিত লেনদেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ব্যবস্থায় সুদ ও ব্যবসায়িক লেনদেন এক অপরের সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়ে এবং একটির উন্নতি অন্যটির উন্নতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। মুনাফা অর্জনের প্রবণতা সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, মানবিক মূল্যবোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দয়া, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব দুর্বল হয়ে যায়। দরিদ্ররা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে কখনো আত্মহত্যার করতেও বাধ্য হয়, আর কখনো অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থার মূলমন্ত্র হলো "আরও বেশি অর্থ উৎপাদন করো"। যা ধনীদের আরও ও ধনী করে তুললেও দরিদ্রদের অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটায় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাংক, বিমা, শেয়ারবাজার, লিমিটেড কোম্পানি ও সুসংগঠিত লেনদেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ব্যবস্থায় সুদ ও ব্যবসায়িক লেনদেন এক অপরের সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়ে এবং একটির উন্নতি অন্যটির উন্নতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। মুনাফা অর্জনের প্রবণতা সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, মানবিক মূল্যবোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দয়া, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব দুর্বল হয়ে যায়। দরিদ্ররা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে কখনো আত্মহত্যার করতেও বাধ্য হয়, আর কখনো অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে

পড়ে। এই ব্যবস্থার মূলমন্ত্র হলো "আরও বেশি অর্থ উৎপাদন করো"। যা ধনীদের আরও ও ধনী করে তুললেও দরিদ্রদের অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটায় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার সাধারণত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কম হস্তক্ষেপ করে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীরা স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সরকার ন্যায্যতার বজায় রাখতে এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে নীতি ও আইন প্রণয়ন করে। তার পরও তারা সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ হয় চাহিদা ও সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে। বাজারে কোনো পণ্যের চাহিদা বেশি হলে তার মূল্য বৃদ্ধি পায়, আর সরবরাহ বেশি হলে মূল্য হ্রাস পায়। ফলে জনগনকে বাড়তি দামে পণ্য ক্রয় করতে হয়। পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক যান সম্পদ আছে তাকে আরো সম্পদশালী করতে ত্বরান্বিত করে। পুঁজিবাদের খারাপ দিকটি হলো—আর্থিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও মন্দা, শ্রমিকদের শোষণ, এবং পরিবেশগত ক্ষতি অন্যতম। এই সীমাবদ্ধতাগুলো সমাজ ও অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং কখনো কখনো ব্যাপক সংকটের সৃষ্টি করে।

নিচে এই বিষয়গুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলো:
১. আর্থিক বৈষম্য

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও আয়ের বণ্টন সমানভাবে হয় না, আর ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য দেখা যায়। কারণ এই ব্যবস্থায় মূলত ব্যবসা, শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানাধীন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত থাকে, আর সাধারণ জনগণ বা শ্রমিক শ্রেণির কম আয় হয়। ধনী শ্রেণি তাদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য নতুন বিনিয়োগ করতে পারে, অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠী একই সুযোগ পায় না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও সেটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ: বিলিয়নিয়র ইলন মাস্ক, জেফ বেজোস, বা মার্ক জাকারবার্গের মতো ব্যবসায়ীরা বিশাল সম্পদের মালিক, যেখানে তাদের কোম্পানিগুলোর সাধারণ কর্মচারীরা ন্যূনতম মজুরির ওপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে বড় কর্পোরেশনগুলো কর্মচারীর ন্যায্য বেতন না দিয়ে তাদের নিজেদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে, যার ফলে আয়ের বৈষম্য বেড়ে যায়।

২. অস্থিরতা ও মন্দা

পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থায় অর্থনীতি মূলত চাহিদা ও সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। এটি একটি স্বাভাবিক বাজার প্রক্রিয়া হলেও এতে মাঝে মাঝেবড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, যা মন্দার সৃষ্টি করতে পারে। যখন কোনো শিল্প বা খাত বেশি মুনাফার আশায় অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে, তখন সরবরাহ বেড়ে যায় কিন্তু চাহিদা না থাকলে বাজার বসে পড়ে। ফলে কর্মসংস্থান হ্রাস পায়, বিনিয়োগ কমে যায় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয়।

উদাহরণ: ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা (Financial Crisis)। যুক্তরাষ্ট্রসহ বাহিরের খাত যখন অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করেছিল, তখন তাৎক্ষণিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও পরে এটি একটি বিশাল মন্দার সৃষ্টি করে।
বিনিয়োগকারীরা যখন বাজার থেকে সরে যায়, তখন বহু ব্যাংক ও কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরি হারায়।

৩. শ্রমিকদের শোষণ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের মূল লক্ষ্য হয় মুনাফা বৃদ্ধি করা, যাঁর জন্য অনেক সময় তারা শ্রমিকদের কম মজুরি দেয়, অতিরিক্ত সময় কাজ করায় এবং কর্মপরিবেশের উন্নতির প্রতি নজর দেয় না। কম খরচে বেশি উৎপাদন করার জন্য কোম্পানিগুলো শ্রমিকদের সুবিধা কমিয়ে আনে, যাতে তাদের উৎপাদন খরচ কম হয় এবং তারা বাজারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে পারে।

উদাহরণ: বাংলাদেশ, চীন, ভারত এবং ভিয়েতনামের মতো উন্নয়নশীল দেশে গার্মেন্টস ও ইলেক্ট্রনিকস শিল্পে শ্রমিকদের অতি কম মজুরিতে দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন ঠিকমতো দেয় না, যা শ্রমিক আন্দোলন ও অস্থিরতার কারণ হয়।
২০১৩ সালে বাংলাদেশের রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হাজারো শ্রমিক মারা যান, যেখানে কর্মপরিবেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, কিন্তু মালিকপক্ষ কেবল মুনাফার কথা ভেবে তাদের কাজে বাধ্য করেছিল।

৪. পরিবেশগত ক্ষতি

পুঁজিবাদের লাভের উদ্দেশ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান শিল্প ও উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পরিবেশকে গুরুত্ব না দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে এবং প্রচুর বর্জ্য উৎপন্ন করে। শিল্প কারখানার অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ, বন উজাড়, ও রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অভাব পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনে।

৫. অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধনী শ্রেণির জন্য ব্যাংক, বিমা ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ সহজলভ্য হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এসব সুবিধা প্রায় অধরা থেকে যায়। ধনীরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রেখে সুদ আয় করতে পারে, বিভিন্ন বীমা কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে সম্পদ বাড়াতে পারে।

কিন্তু দরিদ্র মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতেই পুরো আয় ব্যয় হয়ে যায়, এবং তাদের সঞ্চয় বা বিনিয়োগের সুযোগ থাকে না। ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ নেওয়ার সুবিধাও কেবল ধনীদের জন্য বেশি উন্মুক্ত, কারণ তাদের সম্পদ ও গচ্ছিত ক্ষমতা থাকে।

দরিদ্ররা ঋণ পেলেও উচ্চ সুদের হার দিতে হয় এবং বিনিয়োগ সীমিত হওয়ায় তাদের আরও আর্থিক সংকট কেবল। বীমার ক্ষেত্রেও ধনীরা ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য বিনিয়োগ করতে পারলেও দরিদ্ররা তা করতে পারে না, ফলে দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার মতো জরুরি পরিস্থিতিতে তারা ভয়াবহ আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে মূলধনের প্রয়োজন হয়, যা ধনীদের জন্য সহজলভ্য হলেও দরিদ্রদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। এই ব্যবস্থা ফলে ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে, আর দরিদ্ররা একই অবস্থায় রয়ে যায় বা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে, যা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে।

৬. মদ, জুয়া, নারী ও সুদে ব্যাপক প্রসার ঘটে

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধনী শ্রেণির অর্থনৈতিক সচ্ছলতা তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা এনে দেয়। ফলে তারা নৈতিকতা ও সংযমের অভাবে ভোগ-বিলাস লিপ্ত হয়। ধনী শ্রেণির মানুষ ভোগ-বিলাসের প্রধান উপাদান মদ, জুয়া, নারী ও সুদের প্রতি আসক্তি হয়ে যায়। অতিরিক্ত সম্পদ থাকলে অনেকেই বিলাসীতাকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখে, ফলে তারা নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র আনন্দ ও উত্তেজনার পেছনে ছুটতে থাকে। মদপান নেশা তৈরি করে, জুয়া অর্থের লোভ বাড়ায়, নারীসঙ্গ চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায় এবং সুসংগঠিত লেনদেন অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ায়। এসব অভ্যাস শুধু ব্যক্তিগত জীবনকেই ধ্বংস করে না, বরং পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে অবনতি ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে সমাজে এক ধরনের অনৈতিকতার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। তাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ধনী শ্রেণির অর্থনৈতিক সচ্ছলতা কানের তাদের নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস করে।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মোটামুটি ২ ধরনের হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় — বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও বইয়ে একটু-আধটু তারতম্য থাকে, তবে মূল কাঠামো একই।

১) লিবারেল মার্কেট ইকোনমি (Liberal Market Economy – LME)

এটাকে আপনি খাঁটি পুঁজিবাদ বলতে পারেন।
এখানে বাজারই সব ঠিক করে—

দাম

উৎপাদন

মজুরি

প্রতিযোগিতা

উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া।

২) কো-অর্ডিনেটেড মার্কেট ইকোনমি (Coordinated Market Economy – CME)

এখানে রাষ্ট্র কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমবাজারকে সমন্বয় করে। বাজার স্বাধীন, কিন্তু পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া নয়।

উদাহরণ: জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, জাপান।

৩.১.২ কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা : COMMUNIST ECONOMIC SYSTEM

কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা অর্থ উৎপাদনের সমস্ত উপায় সমাজের সম্মিলিত মালিকানায় অবস্থিত থাকে, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফার সুযোগ নেই। ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সমাজের, এবং প্রত্যেকে সমাজের নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে হয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ এখানে ব্যক্তি মালিকানা নিষিদ্ধ এবং সুদের কোনো স্থান নেই। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে কমিউনিজমের আদর্শিক বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে, এবং তারা আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দিকে ফিরে গেছে। ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার না থাকায় তার কাজের প্রতি আগ্রহ কমে যায়, ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। কমিউনিস্ট সরকার জনগণের স্বাধীনতা দমন করে এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসন কায়েম করে, কারণ মানব প্রকৃতি কমিউনিজমের কঠোর বিধিনিষেধ মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এর ফলে, রাশিয়ার মতো দেশগুলোতে স্বৈরশাসন ও দমন-পীড়ন চালিয়ে কমিউনিজম টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য:

কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে খুবই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।
কেননা বিশ্ব এই নাস্তিক্যবাদি মতবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থায় যে একটি বাতিল মতবাদ তা বুঝাতে আগে কষ্ট হলেও এখন আর কষ্ট হচ্ছে না। কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থার বড় দুই প্রবর্তক রাশিয়া ও চীন আস্তে আস্তে কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে।

১. ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ:

কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ। এর মধ্যে, সমস্ত উৎপাদন উপকরণ যেমন— জমি, কারখানা, এবং অন্য যন্ত্রপাতি রাষ্ট্র বা সমাজের মালিকানায় থাকে। ব্যক্তির কোনো অধিকার থাকে না, তারা যা উৎপাদন করেছে, তার উপর মালিকানা দাবি করতে পারে না।

উদাহরণ: সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া) ১৯৭১ সালের রুশ বিপ্লবের পর, যে জমি, খামার এবং কারখানাগুলি ছিল, সেগুলি সরকার পরিচালনা করত। কৃষক ও শ্রমিকরা আর নিজেদের স্বতন্ত্র মালিকানা দাবি করতে পারত না, বরং তারা রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করত।

২. সামাজিক দায়িত্ব:

কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা হয়, যেখানে ব্যক্তি শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করে না, বরং সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করতে উৎসাহিত হয়। ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের প্রতিদান সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিগত লাভ না থাকায় মানুষ কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

চীনের কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে, শ্রমিকেরা বেশিরভাগ সময় সরকারের পরিচালিত প্রকল্পগুলিতে কাজ করত এবং সরকারের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হতো। এখানে, ব্যক্তির লাভ ছিল না, বরং সমাজের কল্যাণের জন্য তাদের কাজ করতে বলা হতো।

৩. ধন-বণ্টন সমতা:
কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল সমাজে ধন-বণ্টন সমতা প্রতিষ্ঠা করা, যাতে ধন-সম্পদ নির্দিষ্ট কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করা হয়। এখানে, সবার জন্য সমান সুযোগ এবং উপকরণ প্রদান করার লক্ষ্য রাখা হয়।

৪. সুদবিহীন অর্থনীতি:

কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থায় সুদকে নিষিদ্ধ করে, কারণ এটি ধনী ও গরিবের মধ্যে আরও বৈষম্য সৃষ্টি করে। এখানে, অর্থনৈতিক লেনদেনে সুদের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনে সুদবিহীন ব্যবস্থা ছিল। এখানে, রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুষ্ঠু ঋণ প্রদান করা হতো, যাতে সম্পদ সঞ্চয় এবং বিতরণের মধ্যে বৈষম্য না আসে।

৫. প্রকৃত বাস্তবতা:

কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থার বাস্তব রূপ অনেক জায়গায় জয়লাভ হয়েছিল, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর আদর্শ পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনে কমিউনিজমের প্রয়োগ, পরবর্তী পুঁজিবাদীদের দিকে ঝুঁকেছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা অনেক সময় কমিউনিস্ট আদর্শের বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে পুনরায় ফিরে যায়। রাশিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বাজার অর্থনীতির পুনঃস্থাপন করা হয়। চীনে কিছু বাজারভিত্তিক সংস্কার চালু করা হয়, যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা হয়।

৩.১.৩ ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা:

কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষের আর্থিক কর্মকাণ্ডকে ন্যায়, সাম্য, দায়িত্বশীলতা ও কল্যাণের ভিত্তিতে পরিচালনার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যেখানে,

সম্পদের সঠিক বণ্টন,

সুদ (রিবা) নিষিদ্ধকরণ,

জাকাত ও সদকার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা,

হালাল উপার্জন ও ব্যয়ের নীতি
মূল কাঠামো হিসেবে কাজ করে।

আরও সহজভাবে—
ইসলামী অর্থনীতি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সম্পদ হালাল পথে অর্জন, ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মূল লক্ষ্য

1. ন্যায় ও ভারসাম্য নিশ্চিত করা (ব্যক্তি–সমাজ–রাষ্ট্র)

2. সুদমুক্ত আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলা

3. সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করা

4. গরীব–দরিদ্রের অধিকার রক্ষা করা

মূল ভিত্তি

কুরআন

সুন্নাহ

ইজমা

কিয়াস।

৩.১.৪ মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা

মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদ (ধনতান্ত্রিক) এবং সমাজতন্ত্র (নির্দেশমূলক বা নিয়ন্ত্রিত) এই দুটি ব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে গঠিত হয়। এটি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন এবং ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।
সহজ কথায়, এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়েরই সহাবস্থান থাকে।

মিশ্র অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য

মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:
ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার সহাবস্থান: এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সরকারি উদ্যোগ উভয়ই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করে। কিছু শিল্প বা ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে, কিছু ক্ষেত্র সরকারের মালিকানায় থাকে এবং কিছু ক্ষেত্রে উভয়ের অংশীদারিত্ব থাকে।

বাজার ব্যবস্থা ও সরকারি পরিকল্পনার মিশ্রণ: অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো আংশিকভাবে বাজার প্রক্রিয়ার (চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে) মাধ্যমে এবং আংশিকভাবে সরকারি পরিকল্পনা বা নির্দেশের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

লাভের সুযোগ: বেসরকারি ক্ষেত্রগুলোর জন্য মুনাফা বা লাভ করার সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, যা পুঁজিবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। তবে এই লাভ সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা নীতিমালার আওতাধীন হতে পারে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয়ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে। ভোক্তারা তাদের পছন্দমতো পণ্য কেনেন এবং উৎপাদকরা লাভজনক পণ্য উৎপাদন করেন। তবে সরকার প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

জনকল্যাণ: এই ব্যবস্থায় সরকার কিছু অপরিহার্য শিল্প বা জনসাধারণের কল্যাণের সাথে জড়িত ক্ষেত্রকে (যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, ইত্যাদি) নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে বা জাতীয়করণ করতে পারে, যা সমাজতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা (Benefits)

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা: এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতো দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিতে পারে এবং একই সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো সামাজিক সমতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়।
সম্পদের সুষম বণ্টন: সরকার দরিদ্র বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য ভর্তুকি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদের অসমতা কমাতে পারে।
স্বাধীনতার নিশ্চয়তা: ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পছন্দের স্বাধীনতা বজায় থাকে।
উন্নত পরিকাঠামো: সরকার প্রায়শই রেল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগ করে, যা বেসরকারি খাতের জন্য ততটা লাভজনক নাও হতে পারে।

অসুবিধা (Drawbacks)

অদক্ষতা: সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সমন্বয়হীনতা দেখা যেতে পারে, যা অদক্ষতার কারণ হতে পারে।
দুর্নীতি: রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।
জাতীয়করণ এবং নিয়ন্ত্রণ: সরকার কোনো শিল্পকে জাতীয়করণ করলে বা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে।

উদাহরণ
বিশ্বের বেশিরভাগ আধুনিক অর্থনীতি, যেমন ভারত এবং বাংলাদেশ, মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থার অন্তর্গত। এই দেশগুলোতে যেমন বেসরকারি ব্যাংক, মোবাইল কোম্পানি রয়েছে, তেমনই সরকারি ব্যাংক, রেলওয়ে, এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো ক্ষেত্রও সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

৩.২ বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান:

বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Global Financial Institutions)

বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Global Financial Institutions) হলো এমন সংস্থাগুলো, যেগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে আর্থিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ, ঋণ প্রদান এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থিক উন্নয়ন ও বৈশ্বিক অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কাজ করে। পৃথিবীতে বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের নামে সুদ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা করছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ১০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম নিচে দেওয়া হলো—

১. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF - International Monetary Fund)
২. বিশ্ব ব্যাংক (World Bank)
৩. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO - World Trade Organization)
৪. ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IsDB - Islamic Development Bank)
৫. নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB - New Development Bank, BRICS Bank)
৬. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB - Asian Development Bank)
৭. ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস (BIS - Bank for International Settlements)
৮. আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক (AfDB - African Development Bank)
৯. ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (EIB - European Investment Bank)
১০. ইন্টার-আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB - Inter-American Development Bank)

১. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কাজ করে। এটি মূলত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য ঋণ প্রদান, আর্থিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস:

১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস সম্মেলনে IMF গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চূড়ান্ত কার্যক্রম শুরু: ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালে। বর্তমানে ১৯০টিরও বেশি দেশ এর সদস্য।

মূল লক্ষ্য:

বৈশ্বিক আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা সুসংহত করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহজতর করা।

মূলধনের উৎস:

IMF-এর অর্থের প্রধান উৎস হলো সদস্য দেশগুলোর অংশীদারিত্ব মূলধন (Quota Subscriptions)। প্রতিটি দেশ তাদের অর্থনৈতিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিল প্রদান করে, যা প্রয়োজনে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

বিনিয়োগ খাত:

IMF সাধারণত নিম্নলিখিত খাতে বিনিয়োগ বা ঋণ প্রদান করে:

(১) অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোতে জরুরি ত্রাণ ঋণ।

(২) সংকটাপন্ন দেশগুলোর মুদ্রা স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে।

(৩) বৈশ্বিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়ন।

(৪) দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো সংস্কারে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর ঋণ আদান প্রদানের পদ্ধতি:

IMF সাধারণত সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিক সংকট বা মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ঋণ প্রদান করে। সদস্য দেশ মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের সময় IMF-এর কাছে ঋণের জন্য আবেদন করে।

IMF দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে, নির্দিষ্ট সংস্কার নীতিমালা অনুমোদনের পর দেশটিকে পর্যায়ক্রমে ঋণ আরোপ করে। IMF স্বল্পমেয়াদি (৩-৫ বছর) ও দীর্ঘমেয়াদি (১০-২০) ঋণ দিয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান ঋণ আদায়ের পদ্ধতি বেশ কঠিন ও কঠোর। কোনো দেশ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে IMF নতুন ঋণ বন্ধ করে দেয়। কিছু ক্ষেত্রে দেশটির উপর অতিরিক্ত সুদ ও জরিমানা আরোপ করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠান কোনো অনুদান দেয় না

IMF অনুদান দেয় না, এটি মূলত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র দেশগুলোর জন্য স্বল্পসুদে বা শর্তসাপেক্ষে বিশেষ ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় বিশেষ ঋণ কর্মসূচি অর্থাৎেশ ঋণ দেয়।

বৈশ্বিক অবদান:

(১) বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

(২) দরিদ্র দেশগুলোতে ঋণ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

(৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করা।

(৪) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখা।

(৫) বৈশ্বিক আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করা।

২. বিশ্ব ব্যাংক (World Bank)

বিশ্ব ব্যাংক হলো একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে ঋণ ও অনুদান প্রদান করে। এটি মূলত বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক (Multilateral Development Bank - MDB) হিসেবে কাজ করে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস:

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংক গঠিত হয় ১৯৪৪ সালের ১ জুলাই মাসে।

তবে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৪৬ সাল থেকে। বর্তমান প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর ওয়াশিংটন, ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্ব ব্যাংকের মূল লক্ষ্য

১. দারিদ্র্য বিমোচন (Eradicating Poverty)

২. টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development)

৩. অবকাঠামো ও শিক্ষা উন্নয়ন

৪. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা

৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি

বিশ্ব ব্যাংকের মূলধনের উৎস: বিশ্ব ব্যাংকের মূলধন আসে নিম্নলিখিত উৎস থেকে-
১. সদস্য দেশগুলোর চাঁদা (Membership Contributions)
২. আন্তর্জাতিক বন্ড বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ
৩. ঋণের সুদ থেকে প্রাপ্ত আয়
৪. বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থার অনুদান

বিশ্ব ব্যাংকের বিনিয়োগ খাত: বিশ্ব ব্যাংক নিম্নলিখিত খাতগুলোতে বিনিয়োগ করে
১. অবকাঠামো (Infrastructure)
২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (Education & Healthcare)
৩. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা (Agriculture & Food Security)
৪. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা (Climate Change)
৫. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (Technology & Innovation)
৬. সামাজিক নিরাপত্তা (Social Safety Nets)
৭. নারী ও শিশু উন্নয়ন (Women & Child Development)

ঋণ আদান-প্রদানের পদ্ধতি: বিশ্বব্যাংক মূলত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করে।
ঋণ প্রদান পদ্ধতি
সাধারণ ঋণ (Regular Loans): ৩০-৪০ বছর মেয়াদি, স্বল্প সুদে দেওয়া হয়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশ্ব ঋণ (IDA Loans): একেবারে নামমাত্র সুদে বা সুদবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়।
জরুরি ঋণ (Emergency Loans): দুর্যোগ বা অর্থনৈতিক সংকটের সময় দ্রুত ঋণ প্রদান করা হয়।
বিশেষ প্রকল্পভিত্তিক ঋণ (Project-Based Loans): শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ইত্যাদির জন্য ঋণ দেওয়া হয়।
অনুদান বা সেবা খাত: বিশ্ব ব্যাংক অনুদান ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে নিম্নলিখিত খাতে-
১. দারিদ্র্য বিমোচন
২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৩. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা

৪. কৃষি উন্নয়ন
৫. মানবাধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন

বিশ্বব্যাপি অবদান:
১৯৪৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক ১০০+ দেশে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। প্রতি বছর প্রায় ৳৫০- ৬০ বিলিয়ন ঋণ ও অনুদান দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৳২০০ বিলিয়ন বিনিয়োগের পরিকল্পনা।

৩.
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা: World Trade Organization (WTO)
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যা বিশ্বব্যাপি বাণিজ্য নীতি এবং নিয়মাগুলি প্রতিষ্ঠা এবং প্রবর্তন করে। এটি বিশ্বব্যাপি বাণিজ্য সমঝোতা বা চুক্তির পর্যবেক্ষণ, সমস্যা সমাধান এবং বাণিজ্য-বিষয়ক আলোচনা করে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
WTO ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে গ্যাট (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade, নাম একটি চুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সমাধান করা হতো। গ্যাট ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৫ সালে WTO গঠন হয়, যা গ্যাট এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কার্যক্রম এবং চুক্তি পালন করে।

WTO-এর প্রধান লক্ষ্য হলো:
১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করা।
২. বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ কমানো।
৩. বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করা।
৪. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ সমাধান করা।
৫. বাণিজ্য সম্পর্কিত সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রতিষ্ঠানের মূলধনের উৎস

WTO মূলত সদস্য দেশগুলির বার্ষিক সদস্যপদ ফি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অবদান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। এটি কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, তাই এর মুনাফা লক্ষ্য নয়।

প্রতিষ্ঠানের কাজ:

WTO কোনো বিনিয়োগকারী সংস্থা নয়, তবে এটি সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ এবং সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এটি মূলত বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি ও নীতি সংস্কারে কাজ করে। WTO কোনো সরাসরি ঋণ প্রদান না করলেও, বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা এবং সহায়তা প্রদান করে।

WTO মূলত বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন খাতে সেবা প্রদান করে:

১. বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত পরামর্শ এবং বিশ্লেষণ।

২. বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ।

৩. সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বিরোধ সমাধানে সাহায্য।

৪. বাণিজ্য উন্নয়নে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ।

বৈশ্বিক অবদান

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতি আস্থা বেড়েছে এবং বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক আরও সুষ্ঠু হয়েছে, যার ফলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং চাকরির সুযোগ বেড়েছে।

৪. ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB)

Islamic Development Bank (IDB)

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB), একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক যা ইসলামিক অর্থনীতির নীতিমালা অনুসরণ করে এবং সদস্য দেশগুলোর আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে। এটি একটি উন্নয়ন ব্যাংক, যা মূলত ইসলামিক অর্থনৈতিক নীতি ও প্রিন্সিপালস অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

IDB প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে, সৌদি আরবের জেদ্দাতে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৫৪টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সহযোগিতায় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করা। এর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি আর্থিক নীতির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা।

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য: IDB-এর প্রধান লক্ষ্য হলো

১. সদস্য দেশগুলোর আর্থিক, সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
২. মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৩. ইসলামিক অর্থনীতি এবং শরিয়া ভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান।
৪. উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।
৫. গরিব এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রতিষ্ঠানের মূলধনের উৎস

IDB-এর মূলধন সংগ্রহ করা হয় সদস্য দেশগুলোর থেকে অবদান এবং শেয়ার হোল্ডিংয়ের মাধ্যমে। এর মূলধন উৎস সদস্য রাষ্ট্রের শেয়ার এবং তাদের বার্ষিক অবদান থেকে আসে, যা ব্যাংকটি তার পরিচালনা এবং উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করে।

প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ খাত: IDB বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। যেমন—

১. অবকাঠামো প্রকল্প (যেমন— সড়ক, স্কুল, হাসপাতাল, বিদ্যুত কেন্দ্র)
২. কৃষি উন্নয়ন
৩. স্বাস্থ্যসেবা খাত
৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
৫. পরিবেশ উন্নয়ন
৬. পানি এবং স্যানিটেশন
৭. তথ্যপ্রযুক্তি (IT খাতে উন্নয়ন)

প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদান প্রদানের পদ্ধতি

IDB ইসলামি অর্থনীতির নীতি অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করে, যার মধ্যে সুদের হার না থাকার কারণে এটি অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের থেকে আলাদা। ব্যাংকটি তার ঋণ এবং ফাইন্যান্সিং পরিষেবা বিভিন্ন ইসলামি ফিন্যান্স প্রিন্সিপাল অনুসারে প্রদান করে। যেমন-

১. মুদারাবাহ (Mudarabah): - লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা।

২. মুশারাকা (Musharaka): - অংশীদারীদারি ভিত্তিক ব্যবসা।

৩. মুরাবাহা (Murabaha): - খরচের উপর নির্ধারিত মুনাফা।

৪. ইজারা (Ijara): - লিজ বা ভাড়া ভিত্তিক ফাইনান্সিং।

প্রতিষ্ঠান যে যে খাতে অনুদান বা সেবা খাত প্রদান করে:

IDB সদস্য দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে অনুদান এবং সেবা প্রদান করে, যেমন-

১. স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন

২. শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ

৩. ত্রাণ কার্যক্রম (যথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে)

৪. খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষি উন্নয়ন

৫. অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়ন

৬. গবেষণা এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন

৫. নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)

New Development Bank, BRICS Bank (NDB)

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB), একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক, যা মূলত BRICS (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা)-এর সদস্য দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। এটি উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করে এবং সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে কাজ করে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

NDB প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালে, ৫টি BRICS সদস্য দেশ (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা) দ্বারা। এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা

প্রদান এবং ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকগুলোর তুলনায় একটি বিকল্প ও সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করা। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় সাংহাই, চীনে এবং প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ব্যাংক গঠনের কথা হয়েছিল শুধু উন্নত অর্থনীতি ভিত্তিক দেশগুলোর সমন্বয়ে।

NDB-এর প্রধান লক্ষ্য হলো:

১. BRICS সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়ন বৃদ্ধি করা।
২. উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য স্থিতিশীল এবং সুবিধাজনক ঋণ সুবিধা প্রদান।

৩. পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা।
৪. গরিব দেশগুলোর জন্য অবকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদান প্রদানের পদ্ধতি

NDB সুদের হার ছাড়াই এবং সাধারণত কম সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সুবিধাজনক।
এটি ঋণ প্রদান করার সময় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সামাজিক, পরিবেশগত এবং আর্থিক প্রভাব বিবেচনা করে। NDB ঋণ প্রদান করতে গিয়ে উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করে-

সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান
বিভিন্ন ধরনের ফাইন্যান্সিং মডেল, যেমন—পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)
অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

NDB-এর বৈশ্বিক অবদান ব্যাপক

NDB বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি বিকল্প ঋণদাতা হিসেবে কাজ করছে এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। NDB নতুন উন্নয়ন ব্যাংক হিসেবে একটি তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের বিকল্প। এটি বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। BRICS দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে। পরিবেশবান্ধব প্রকল্প এবং সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলোর জন্য বিশ্বব্যাপী সহায়তা প্রদান করছে। NDB বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধি আনতে এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গঠন পুনর্গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB - Asian Development Bank)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ, অনুদান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এটি মূলত একটি উন্নয়ন ব্যাংক, যার উদ্দেশ্য আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

ADB প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে, ফিলিপাইনের ম্যানিলায়। এটি ৩১টি দেশের উদ্যোগে গঠন করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১৯টি এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ এবং ১২টি অন্যান্য উন্নয়ন দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল এশিয়া অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

ADB-এর প্রধান লক্ষ্য হলো:

১. এশিয়া অঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ।

২. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

৩. অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবহন, বিদ্যুৎ, জল ও স্যানিটেশন খাতে উন্নয়ন করতে সহায়তা করা।

৪. পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৫. সদস্য দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা এবং নীতি-সহায়তা প্রদান করা।

প্রতিষ্ঠানের মূলধনের উৎস

ADB-এর মূলধন উৎস সদস্য দেশগুলোর অবদান এবং শেয়ারহোল্ডিং থেকে আসে। ব্যাংকটির মোট শেয়ারধারণী দেশ রয়েছে ৬৭টি (২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী)। সদস্য দেশগুলোর বার্ষিক শেয়ার এবং অর্থনৈতিক অবদানই ব্যাংকটির মূলধনের প্রধান উৎস। এছাড়াও, বিশ্ববাজারে সরকারি এবং বেসরকারি ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক উৎস থেকেও অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

৭. ফেডরাল রিজার্ভ ব্যাংক (FED)

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে ফেডরাল রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রিজার্ভ ব্যাংককে সংক্ষেপে ফেড (FED) বলা হয়। এটি মার্কিন অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ব্যাংকিং খাতের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ। ফেডরাল রিজার্ভ ব্যাংকের মূল কাজ হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, সুদের হার

নির্ধারণ করা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নজরদারি করা। এটি অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এটি মার্কিন ডলারের সরবরাহের মাধ্যমে দেশটির আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতেও বড় ভূমিকা রাখে। ফেডরাল রিজার্ভ ব্যাংক কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

ফেডরাল রিজার্ভ ব্যাংক (Federal Reserve System)

২৩ ডিসেম্বর ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যা "Federal Reserve Act" দ্বারা কংগ্রেসের অনুমোদিত হয়। ১৯০৭ সালের ব্যাংকিং সংকটের পর মার্কিন অর্থনীতির স্থিতিশীল করার জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য

ফেডরাল রিজার্ভের প্রধান লক্ষ্য হলো—

১. মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা।

২. পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা বেকারত্বের হার কমানোর জন্য নীতি নির্ধারণ করা।

৩. ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা।

৪. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা সুদের হার এবং মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রতিষ্ঠানের মূলধনের উৎস

ফেডরাল রিজার্ভ একটি স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যার মূলধন আসে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ থেকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সরাসরি অর্থায়ন করা হয় না, বরং এর নিজস্ব কার্যক্রম থেকে আয় করে।

প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ খাত

১. ফেডরাল রিজার্ভ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। যেমন—

২. সরকারি বন্ড ও ট্রেজারি বিল ক্রয়-বিক্রয়

৩. স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান

৪. ব্যাংকগুলোর মাঝে অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা
৫. আর্থিক বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।

৩.৩ আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার পরিচিতি ও প্রকারভেদ

৩.৩.১ ব্যাংকের সংজ্ঞা
প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আর. পি. ক্যান্টের মতে ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বলা হয়: 'যা ঋণের কারবার করে এবং মুদ্রা সৃষ্টি করতে পারে।'

ইম্পেরিয়াল ডিকশনারিতে ব্যাংকের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে: 'ব্যাংক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যা অর্থের ব্যবসায় নিরত। নিজ দায়িত্বে টাকা জমা রাখে, অর্থ প্রচার করে, ঋণ মঞ্জুর করে, বিল বাট্টা করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মূল্য স্থানান্তর করে।'

আল্লামা তাকী উসমানী ব্যাংকের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন:

'ব্যাংক এমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বলা হয়, যা মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করে ব্যবসায়ী শিল্পপতি ও পুঁজির সংকটে নিপতিত ব্যক্তিদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে। আজকাল আধুনিক ব্যাংকিংগুলো ব্যাংক টাকা আমানতকারীদেরকে স্বল্পহারে সুদ প্রদান করে। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করে এবং থাকে। এতে যে মধ্যস্বত্ত্ব লাভ হয় তাই ব্যাংকের মুনাফা বলে গণ্য হয়।'

উপরোক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে আমরা ব্যাংকের সংজ্ঞা এভাবে দিতে পারি যে, 'ব্যাংক অর্থের লেনদেনকারী এমন এক মধ্যস্বত্ত্বভোগী প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত, উচ্ছিষ্ট ও নিষ্ক্রিয় পুঁজি সমূহ সংগ্রহ করত: বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ ও পুঁজির প্রত্যাশী ব্যক্তিদেরকে উচ্চ সুদ বা লাভের শর্তে ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে এবং নোট ও চেকের প্রচলন দান, অর্থ সংরক্ষণ, বিল বাট্টাকরণ, অর্থ স্থানান্তর ও অর্থ সংক্রান্ত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে মুনাফা অর্জন করে থাকে।'

৩.৩.২ ইতিহাসের আলোকে ব্যাংকব্যবস্থা

ব্যাংকব্যবস্থার ইতিহাস অনেক পুরনো। প্রাচীন ব্যবিলন, রোম, ভারত ও চীনসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকব্যবস্থা চালু ছিল। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যবিলনে বর্তমান বিশ্বের ব্যাংকব্যবস্থার মতোই ঋণ লেনদেন ব্যবস্থা চালু ছিল। সেই সময়ের মাটির ফলকগুলো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। প্রায় ৩,৭০০ বছর আগে পাথরে খোদাই করা হাম্মুরাবি কোডও ঋণ আদান প্রদানের নীতিমালার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর জুলিয়াস সিজারতো (প্রাচীন রোমের রাজা) ব্যাংকের সম্পর্কে আইনই জারি করেন।

তবে প্রাচীন যুগের ব্যাংকগুলো সবদিক থেকে আজকের বিশ্বের ব্যাংকগুলোর মতো ছিল না। আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি, তার শুরু রেনেসাঁ যুগের ইউরোপ থেকে। সেই সময় ইউরোপের ইতালি অঞ্চলটি অনেকগুলো ছোট ছোট নগর ও জমিদারিতে বিভক্ত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এই নগরগুলোয় কিছু সংখ্যক অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এদেরই একটি ফ্লোরেন্সে ১৩৯৭ সালে সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালির বিখ্যাত মেদিচি পরিবারের হাতে গড়া এ ব্যাংকটির নাম ছিল 'মেদিচি ব্যাংক'। পরবর্তীকালে তার অনুকরণে ইতালির অন্যান্য সমৃদ্ধ শহরে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ইউরোপে ব্যাংকব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে।

৩.৩.৩ ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ:

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংককে সাধারণত, তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১. সরকারি ব্যাংক,
২. বেসরকারি ব্যাংক,
৩. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক।
যেসব ব্যাংক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিংবা সরাসরি সরকারের পরিচালনাহীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে ব্যাংকিং কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়, সেসব ব্যাংককে বলা হয় সরকারি ব্যাংক।

সরকারি ব্যাংককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক,
২. সাধারণ ব্যাংক।

যে ব্যাংক দেশের সমস্ত ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে বলা হয় 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক'। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন 'বাংলাদেশ ব্যাংক'।

আর যে ব্যাংক সরাসরি সরকারের পরিচালনাহীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়, সেগুলোকে বলা হয় সাধারণ সরকারি ব্যাংক। যেমন: সোনালী ব্যাংক ইত্যাদি।

যেসব ব্যাংক বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় বেসরকারি ব্যাংক। যেমন, সিটি ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি।
বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১. তফসিলি ব্যাংক,
২. অতফসিলি ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকেই তফসিলি ব্যাংক বলা হয়। আর যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নয়, সেগুলোকে বলা হয় অতফসিলি ব্যাংক। কোনো দেশের সব ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত থাকা অপরিহার্য নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বেসরকারি ব্যাংককে তার তালিকাভুক্ত করে থাকে। তফসিলি ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকে।

তফসিলি অতফসিলি নির্বিশেষে সব বেসরকারি ব্যাংককে মালিকানাভেদে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১. একব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক
২. অংশীদারী ব্যাংক,
৩. যৌথ মালিকানাধীন (কোম্পানী ধরনের) ব্যাংক।

যে ব্যাংকের একজন মাত্র মালিক থাকে তাকে বলা হয়, একব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক।
আর যে ব্যাংক অংশীদারী কারবারের আইনের অধীনে ব্যাংকিং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে অংশীদারী ব্যাংক বলে।
আর যে ব্যাংক কোম্পানী আইনের আওতায় ব্যাংকিং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, তাকে যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলে।

অংশীদারী ব্যাংকে ২ থেকে ১০ জন পর্যন্ত অংশীদার থাকতে পারে। আর যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংকে অংশীদার অনেক হতে পারেন।

যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা:
১. সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানা,
২. শুধুমাত্র বেসরকারি যৌথ মালিকানা।

যেসব ব্যাংক সরকার ও নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, সেগুলোকে বলা হয় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানা ব্যাংক। যেমন উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ইত্যাদি।

আর যেসব ব্যাংক কেবলমাত্র নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোকে বলা হয় বেসরকারি যৌথ মালিকানা ব্যাংক। যেমন সিটি ব্যাংক, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি।

আর যেসব ব্যাংক সরকারি বিশেষ আইনের অধীনে গঠিত অথচ স্বনিয়ন্ত্রিত, সেগুলোকে বলা হয় স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। যেমন কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ইত্যাদি।

একটি দেশে যতগুলো ব্যাংক গড়ে ওঠে তার সবগুলোর পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ধরণ এক হয় না এবং সেগুলোর কার্যক্ষেত্র ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যও এক রকম নয়।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ব্যাংকিং কাজের ধরণ ও প্রকৃতির ভিত্তিতে ব্যাংককে বহু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
খ. শিল্প ব্যাংক (Industrial Bank)
গ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক (Small Industry Bank)
ঘ. কৃষি ব্যাংক (Agricultural Bank)
ঙ. গ্রাম্য ব্যাংক (Village Bank)
চ. সমবায় ব্যাংক (Co-Operative Bank)
ছ. বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank)

জ. বিনিময় ব্যাংক (Irnagaction Bank)
ঝ. সঞ্চয়ী ব্যাংক (Saving Bank)
ঞ. গৃহায়ণ ব্যাংক (House Building Financial Bank)
ট. উন্নয়ন ব্যাংক (Development Bank)

কর্ম অঞ্চলের ভিত্তিতে ব্যাংককে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১. দেশী ব্যাংক
২. বিদেশী ব্যাংক
৩. আঞ্চলিক ব্যাংক
৪. আন্তর্জাতিক ব্যাংক।

যে ব্যাংক দেশীয় উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে স্বল্প পরিসরে ঋণ দিয়ে থাকে, তাকে বলা হয় দেশীয় ব্যাংক। আর দেশের অভ্যন্তরে ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত যে ব্যাংক সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানায় গঠিত, তাকে বলা হয় বিদেশী ব্যাংক। যথা গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক ইত্যাদি। আর যে ব্যাংক কোনো বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে, তাকে বলা হয় আঞ্চলিক ব্যাংক। আঞ্চলিক ব্যাংক একটি দেশের বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে। যেমন- রাজশাহী উন্নয়ন ব্যাংক। আবার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে। যেমন ‘এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’ A.D.B. ‘ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’ I.D.B. ইত্যাদি।

৩.৪ বিভিন্ন ব্যাংকের কার্যাবলি:

ব্যাংকের কার্যাবলী
ব্যাংকের কার্যাবলী মৌলিকভাবে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১. আমানত গ্রহণ ও মূলধন সংগ্রহ
২. সঞ্চিত মূলধন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতা
৪. মুদ্রা বিনিময় ও বিল বাট্টাকরণ
৫. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টিকরণ।

৩.৪.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তার কার্যাবলি:

জেমস স্টিফেনসনের মতে: 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের প্রধান ব্যাংকিং
প্রতিষ্ঠান। যা দেশের সার্বিক অগ্রগতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে অর্থনৈতিক সমতা বিধান ও মুদ্রার মূল্যমানের স্থিতিশীলতা রক্ষার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে।'

আরপি কান্টের-এর মতে : 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে একটি দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।'

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংক', পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান', ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি।
বস্তুত: কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে অভিভাবক হয়ে থাকে এবং এটি সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক একমাত্র দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব।

নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ কার্যাবলীর উল্লেখ করা হলো:
১. নোট ও মুদ্রা প্রবর্তন করা,
২. মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করা,
৩. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি করা,
৪. মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা রাখা,
৫. বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা,
৬. রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে সরকারের তহবিল (বিনাসুদ) সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে (বিনাসুদ) সরকারকে ঋণ দান, সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও পরামর্শ দান করা,
৭. দেশের সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরুব্বীয়ানা, তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা,
৮. অন্যান্য ব্যাংকে রিজার্ভ ফান্ড সংরক্ষণ করা,
৯. প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যাংকে ঋণ দান করা,
১০. রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোকে অন্যান্য ব্যাংকে বিতরনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা,

১১. বিভিন্ন ব্যাংকের পারস্পরিক লেনদেনের মাঝে সমন্বয় সাধন করা অর্থাৎ নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করা।

১২. অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা,

১৩. আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের মুদ্রামান সংরক্ষণ করা,

১৪. ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং

১৫. রাষ্ট্র যেসব খাতের উন্নয়ন করতে চায়; বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করা এবং সেই খাতে আর্থিক ঋণ বরাদ্দের জন্য নির্দেশ দিয়ে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা স্থানান্তর, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, সরকারি সিকিউরিটিজ বন্ড, ট্রেজারী বিল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাইতুলমালের উপরোক্ত দায়িত্বসমূহ ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত দায়িত্বও রয়েছে। যেমন:

১. এতিম ও লাওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন,

২. অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ,

৩. কয়েদী ও অপরাধীদের সংশোধন ও ভরণ-পোষণ,

৪. বিনাসুদে ঋণদান ও প্রয়োজনে নাগরিকদের ক্ষতিপূরণ দান,

৫. জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান এবং

৬. ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব হলো, মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করা। আমরা জানি যে, দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে মুদ্রামান হ্রাস পায়, আর মুদ্রাসংকট দেখা দিলে মুদ্রামান বেড়ে যায়। দুটোই স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। তাই যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। আর যদি মুদ্রাসংকট দেখা দেয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে মুদ্রাসংকট কেটে যায়। এই কাজ বিভিন্নভাবে আঞ্জাম দেওয়া হয়।

যথা:

ক. সুদের হার কমবেশি করে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধি করে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতির একটি অন্যতম কারণ হল, মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া। ব্যাংক অধিক হারে চেকের মাধ্যমে ঋণ দিতে পারলে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে তার সুদের হার বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও উচ্চহারে প্রদত্ত ঋণের সুদের হার বাড়াতে হয়। এতে সুদের হার বেশি হলে জনগণ সহজে ঋণ নিতে চায় না। ঋণ বিতরণের হার হ্রাস পেলে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার হ্রাস পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতিও হ্রাস পায়। মুদ্রাসংকট বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্পসুদে ঋণ দিতে শুরু করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোরও সুদের হার কমিয়ে দেয়। এতে জনগণের মাঝে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়; ফলে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাসংকট কেটে যায়।

খ. ট্রেজারী বিল ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ : রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের বন্ড ছেড়ে থাকে। এ বন্ডগুলোর গায়ে তার ফেস ভ্যালু লেখা থাকে, সুদের ভিত্তিতে এগুলো বিক্রি করে সরকার বিভিন্ন ব্যাংক ও জনগণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। অনুরূপভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে হলে সরকার এ ধরনের বিল জারি করে থাকে। ব্যাংকিং পরিভাষায় এগুলোকে ট্রেজারী বিল বলা হয়। সাধারণত এ বিল ছয় মাস মেয়াদী হয়ে থাকে। সরকার যত টাকা সংগ্রহ করতে চায়, প্রতিটি ১০০ টাকা করে সে পরিমাণ টাকার বিল তৈরি করে। এতে ১৪% বা ১৫% সুদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। এ বিলের সুবিধা হল এই যে, সুদের টাকা ডিসকাউন্ট করে বাকি টাকা পরিশোধ করে বিল ক্রয় করা যায়। যেমন ১০০ টাকা মূল্যমানের বিল ১৫% সুদ ডিসকাউন্ট করে ৮৫ টাকায় ক্রয় করা যায়। সাধারণত ব্যাংকগুলোই এ বিল ক্রয় করে থাকে। মোট কত টাকার ট্রেজারী বিল ছাড়া হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা নির্ধারণ করে ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে কোন ব্যাংক কত টাকার বিল ক্রয় করবে তার চাহিদা পেশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বরাদ্দ অনুসারে প্রত্যেক ব্যাংক তার জন্য বরাদ্দ বিলের সুদ ডিসকাউন্ট করে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করে দেয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সরকারি তহবিল থেকে পূর্ণ ১০০ টাকা আদায় করে নেয়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা স্টক এক্সচেঞ্জে এ বিল ডিসকাউন্ট বিক্রি করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি বাজারে অবতরণ করে এবং নির্ধারিত সুদের চেয়ে উচ্চহারে সুদ দেয়ার শর্তে বিল বিক্রি করতে শুরু করে। ফলে অধিক লাভের আশায়

ব্যাংক ও জনসাধারণ ব্যাপক হারে বিল ক্রয় করতে শুরু করে। এতে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে আসে, ফলে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেয়ার ক্ষমতা কমে যায়। যে কারণে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার হ্রাস পায় এবং

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। আবার দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি বাজারে অবতরণ করে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে ট্রেজারি বিল ক্রয় করতে শুরু করে। ফলে যারা বিল ক্রয় করে রেখেছিল, তারা লাভ হচ্ছে দেখে, তা বিক্রি করে দেয়। এতে টাকা বাজারের কাছ থেকে জনগণের কাছে চলে যায় এবং তার বিক্রয় ব্যবহার শুরু হয়। সে কারণে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। এভাবে খোলা মার্কেটে অবতরণ করে বিল ক্রয়-বিক্রয়কে Open Market Operation বলে।

আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিক মূল্যে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে মুদ্রা ক্রয় করে নেয়; ফলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। আবার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে স্বল্পমূল্যে আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রা সরবরাহ করে; ফলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

গ. ঋণ দানের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ: মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক সময় সাধারণ ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারবে, তার সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন- এরূপ আইন করে দেয়া হয় যে, ব্যাংক তার মোট আমানতের শতকরা ৪০% ঋণ দিতে পারবে। কিংবা খাতওয়ারী কোটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন এই মর্মে আইন করে দেয়া হয় যে, মোট আমানতের ২৫% কৃষি খাতে ঋণ দিতে হবে।
এসব বিধি-নিষেধের ফলে ব্যাংকিং স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কম ঋণ দিতে পারে। যে কারণে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার হ্রাস পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি কমে যায়।

ঘ. নতুন নোট ছেপে: অনেক সময় নতুন নোট ছেপেও মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলা করে থাকে।
দ্রষ্টব্য: ইসলামী রীতিনীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালিত হলে সব ক্ষেত্রে সুদবিহীন পদ্ধতির অবলম্বন করতে হবে। অতএব সুদের পরিবর্তে লভ্যাংশের হারে হ্রাস বৃদ্ধি করে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৩.৪.২ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার কার্যাবলি:

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং সংগৃহীত অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান ও বিনিয়োগ করে। এটি আমানতকারীদেরকে অপেক্ষাকৃত কম সুদ বা মুনাফা দেয় এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদ বা মুনাফা নেয়। এই দুই সুদের হারের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের প্রধান মুনাফা।

সহজ কথায়, যে ব্যাংক জনগণের অলস অর্থ সংগ্রহ করে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রধানত দুই ধরনের কাজ করে: ১. প্রধান বা মুখ্য কার্যাবলি এবং ২. সহায়ক বা প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি।

১. প্রধান বা মুখ্য কার্যাবলি (Primary Functions)

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো মুনাফা অর্জনের সাথে সরাসরি যুক্ত:

* আমানত গ্রহণ (Accepting Deposits): এটি ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের হিসাবের মাধ্যমে জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় সংগ্রহ করে।

  * চলতি হিসাব (Current Account): এই হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায়, তবে সাধারণত কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

  * সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account): এতে সীমিত আকারে টাকা জমা ও উত্তোলনের সুযোগ থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া হয়।

  * স্থায়ী হিসাব (Fixed Deposit Account - FDA): একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের (যেমন ৩ মাস, ১ বছর, ৫ বছর) জন্য টাকা জমা রাখা হয়। এতে সুদের হার সবচেয়ে বেশি।

* ঋণ প্রদান (Advancing Loans): সংগৃহীত আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশমতো তারল্য হিসাবে রেখে বাকি অর্থ লাভজনক খাতে ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়। ব্যাংক সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে ঋণ দেয়:

* নগদ ঋণ (Cash Credit)
* অধিবৃত্ত (Overdraft)
* বিল বাট্টাকরণ (Discounting of Bills of Exchange)
* মেয়াদি ঋণ (Term Loan)

* ঋণ আমানত সৃষ্টি (Credit Creation): ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক পরোক্ষভাবে বাজারে অর্থের যোগান বা আমানত সৃষ্টি করে। যখন ব্যাংক কাউকে ঋণ মঞ্জুর করে, তখন নগদ টাকা না দিয়ে ঋণগ্রহীতার নামে একটি হিসাব খুলে দেয়। এই হিসাবের অর্থ যখন চেকের মাধ্যমে লেনদেন হয়, তখন তা নতুন আমানত সৃষ্টি করে।

* বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি (Creating Medium of Exchange): বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট (Bank Draft), পে-অর্ডার (Pay Order), ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ইত্যাদির প্রচলনের মাধ্যমে নগদ অর্থের বিকল্প হিসেবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

২. সহায়ক বা প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি (Secondary/Agency Functions)

প্রধান কার্যাবলি ছাড়াও ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষে বিভিন্ন পরিষেবা ও প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ করে:

* অর্থের স্থানান্তর (Transfer of Funds): ব্যাংক ড্রাফট, টেলিগ্রামিক ট্রান্সফার (TT), ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য করে।

* অর্থ সংগ্রহ ও পরিশোধ (Collection and Payment of Money): গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংক লভ্যাংশ, সুদ, পেনশন, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে এবং অন্যদিকে, বীমার প্রিমিয়াম, কর, ভ্যাট, ঋণের কিস্তি, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি পরিশোধ করে।

* আর্থিক এজেন্টের কাজ (Acting as Financial Agent): গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংক শেয়ার, বন্ড ও অন্যান্য সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করে।

* আর্থিক পরামর্শ (Financial Advice): গ্রাহকদের অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে পরামর্শ দেয়।

* লকার সুবিধা (Locker Facility): মূল্যবান অলঙ্কার, দলিলপত্র, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য গ্রাহকদের লকার সুবিধা প্রদান করে।

* বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা (Aiding Foreign Trade): আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit - L/C) ইস্যু করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় করে।

* অর্থনৈতিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ: বিভিন্ন অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে যা দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক হয়।

৩.৫ ব্যাংক ডিপোজিট ও শরিয়াতের বিধান

৩.৫.১ ব্যাংক ডিপোজিট

ব্যাংক ডিপোজিট হলো গ্রাহকের ব্যাংকে জমা রাখা টাকা, যা ব্যাংক নিরাপদে সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজন হলে গ্রাহককে ফেরত দেয়।
এই জমাকৃত টাকাকে ব্যাংক বিভিন্ন কাজে (ঋণ দেওয়া, বিনিয়োগ ইত্যাদি) ব্যবহার করে।

সহজ ভাষায় উদাহরণ:

যখন কেও সেভিংস অ্যাকাউন্টে ৫,০০০ টাকা জমা রাখে,
সেটাই ডিপোজিট

৩.৫.২ ডিপোজিটের ধরন:

১. Demand Deposit (চলতি/চাহিবামাত্র জমা)

গ্রাহক যেকোনো সময় টাকা তুলতে পারেন।

যেমন: কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সেভিংস অ্যাকাউন্ট

২. Time Deposit (নির্দিষ্ট মেয়াদি জমা)

নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোলা যায় না।

যেমন: FDR, Fixed Deposit

৩.৫.২.১
Demand Deposit (চাহিবামাত্র জমা)

সংজ্ঞা:
Demand Deposit হলো এমন একটি ব্যাংক ডিপোজিট যেখানে গ্রাহক যেকোনো সময় চাহিবামাত্র টাকা উত্তোলন করতে পারেন।
এটি সঞ্চয় বা লেনদেনের জন্য সুবিধাজনক এবং ব্যাংকের তরফ থেকে সাধারণত সামান্য সুদ বা কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

Demand Deposit মোট ২ প্রকার—
১) Current Deposit
২) Savings Deposit

১ Current Deposit (কারেন্ট ডিপোজিট)

সংজ্ঞা:

গ্রাহক যেকোনো সময় চাহিবামাত্র টাকা উত্তোলন করতে পারেন এমন অ্যাকাউন্টকে Current Deposit বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

আনলিমিটেড জমা–উত্তোলন

প্রধানত ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ব্যবহার করে

সাধারণত কোনো সুদ দেওয়া হয় না

চেক বা অনলাইন মাধ্যমে লেনদেন বেশি

High transaction volume থাকে

২ Savings Deposit (সেভিংস ডিপোজিট)

সংজ্ঞা:

ব্যক্তিগত সঞ্চয় রাখার জন্য ব্যবহৃত এমন অ্যাকাউন্ট যেখানে সীমিত ভিত্তিতে লেনদেন করা যায় এবং সামান্য সুদ পাওয়া যায়—সেটি Savings Deposit।

বৈশিষ্ট্য:

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য উপযোগী

সীমিত সংখ্যক লেনদেন অনুমোদিত

ব্যাংক সামান্য হারে সুদ প্রদান করে

এটিএম/চেক—দুটোই ব্যবহৃত হয়

৩.৫.২.২.
Time Deposit (নির্দিষ্ট মেয়াদি জমা)

সংজ্ঞা:

Time Deposit হলো এমন একটি ব্যাংক ডিপোজিট যেখানে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময় (মেয়াদ) পর্যন্ত টাকা ব্যাংকে রাখেন।
মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা তুললে সাধারণত জরিমানা দিতে হয়।

সাধারণত ব্যাংক উচ্চ সুদ দেয়, কারণ টাকা ব্যাংকে দীর্ঘসময় থাকে।

Time deposit ২ ধরনের। যথা:
১.Fixed Deposit (FD)

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একবারে একটি বড় টাকা জমা রাখা হয়

মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সুদসহ উত্তোলন করা যায়

আগেই টাকা তোলার চেষ্টা করলে জরিমানা দিতে হয়

২ Recurring Deposit (RD)

প্রতিমাসে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ছোট ছোট টাকা জমা দেওয়া হয়

মেয়াদ শেষে জমা + সুদ একসাথে উত্তোলন করা যায়

নিয়মিত সঞ্চয়ের জন্য উপযুক্ত।

- সংক্ষেপে:

FD = একবারে বড় টাকা জমা
RD = নিয়মিত ছোট টাকা জমা

৩.৫.৩ লকার
আরবী ভাষায় একে خَزَانَةٌ الْمَقْفُولَة "লকার সঞ্চয়" বলা হয়।
আর তার পদ্ধতি হলো, কোনো ব্যক্তি ব্যাংকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোনো লোহার ‘লকার সিন্ধুক’ ভাড়ার ভিত্তিতে নিয়ে ওই ‘লকার সিন্ধুকে’ সে নিজে টাকা বা অন্য কোনো মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ করে থাকে। ওই টাকা বা সম্পদের সঙ্গে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক থাকে না; এমনকি ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরও এটা জানা থাকে না যে, ওই ‘লকার সিন্ধুকে’র ভেতর কী

জিনিস রাখা আছে? সাধারণত এই ধরনের সিন্ধুকে সোনা, রুপা, মূল্যবান পাথর এবং মূল্যবান কাগজপত্র রাখা হয়ে থাকে। তবে নগদ টাকাও ওই 'লকার সিন্ধুকে' রাখা যায়।

৩.৫.৪ ডিপোজিটসমূহের ক্ষেত্রে শরিয়াতের বিধান

৩.৫.৪.১ Current and Savings Account:

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কারেন্ট (Current) অ্যাকাউন্ট এবং সেভিংস (Savings) অ্যাকাউন্ট-এর ফিকহী বা শরয়ী অবস্থান এবং বিধান ভিন্ন ভিন্ন। এটি মূলত ওই অ্যাকাউন্টে জমা রাখা অর্থের ওপর ব্যাংক কীভাবে লাভ প্রদান করছে তার ওপর নির্ভরশীল।

এখানে উভয় প্রকার অ্যাকাউন্টের শরয়ী বিধান আলোচনা করা হলো:

১. কারেন্ট অ্যাকাউন্ট (Current Account) বা চলতি হিসাব

কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সাধারণত শরীয়তে 'কর্জ' (Loan/Qard) হিসেবে গণ্য হয়।

শরয়ী অবস্থান: ব্যাংক ডিপোজিটকারী বা গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা কর্জ (ঋণ) হিসেবে গ্রহণ করে।

বিধান:

যেহেতু এটি কর্জ, তাই ব্যাংক এই টাকা ব্যবসায় খাটাতে পারে এবং লাভ করতে পারে। কিন্তু ইসলামী ফিকহের মূলনীতি হলো, 'কর্জের ওপর মুনাফা (লাভ) হলো সুদ (রিবা)'। তাই কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ব্যাংক গ্রাহককে যদি তার জমার ওপর কোনো ধরনের অতিরিক্ত অর্থ (মুনাফা বা সুদ) প্রদান করে, তাহলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা না-জায়েজ (হারাম) হবে।

সাধারণত ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কোনো অতিরিক্ত মুনাফা বা সুদ দেওয়া হয় না, ফলে এই হিসাব পরিচালনা করা শরীয়তসম্মত (হালাল)।

২. সেভিংস অ্যাকাউন্ট (Savings Account) বা সঞ্চয়ী হিসাব

সেভিংস অ্যাকাউন্টের শরয়ী অবস্থান নির্ভর করে ব্যাংক এই অর্থ পরিচালনার জন্য কোন চুক্তি ব্যবহার করছে তার ওপর।

সুদের ভিত্তিতে প্রচলিত সেভিংস অ্যাকাউন্ট (হারাম)

শরয়ী অবস্থান: সাধারণ প্রচলিত ব্যাংকগুলো সেভিংস অ্যাকাউন্টের জমার ওপর যে অতিরিক্ত অর্থ বা সুদ প্রদান করে, তা শরীয়তে 'সুদ (রিবা)' হিসেবে গণ্য হয়।

বিধান: এই ধরনের সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখা এবং তার ওপর পাওয়া সুদ গ্রহণ করা না-জায়েজ (হারাম)। কারণ, এখানে মূল অর্থের ওপর নিশ্চিত ও পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হচ্ছে।

৩.৫.৪.২

FD and RD Account :

ফিক্সড ডিপোজিট (FD) এবং রিকারিং ডিপোজিট (RD)-এর প্রচলিত পদ্ধতিটি ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে না-জায়েজ (হারাম)। এর কারণ হলো, উভয় ক্ষেত্রেই যে অতিরিক্ত বা মুনাফা দেওয়া হয় তা সুদ (রিবা) হিসেবে গণ্য হয়।

এখানে বিস্তারিত শরয়ী বিধান এবং ইসলামী বিকল্পগুলি আলোচনা করা হলো:

১. প্রচলিত ফিক্সড ডিপোজিট (Fixed Deposit - FD) এর শরয়ী বিধান

প্রচলিত ব্যাংকগুলোর FD বা স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান না-জায়েজ (হারাম)।

পদ্ধতি: গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন ১ বছর বা ৫ বছর) এককালীন বড় অংকের টাকা জমা রাখে।

রিটার্ন: ব্যাংক জমার ওপর একটি পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত সুদের হার (Fixed Interest Rate) ঘোষণা করে এবং মেয়াদ শেষে মূল টাকার সাথে সেই সুদ প্রদান করে।

শরয়ী সমস্যা: ইসলামে 'রিবা' (সুদ) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। FD-তে লাভের পরিমাণ চুক্তির শুরুতেই সুদের হার হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, যা বিনিয়োগের প্রকৃত লাভ-ক্ষতির ওপর নির্ভরশীল নয়। যেহেতু এটি নিশ্চিত ও পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ, তাই এটি সরাসরি সুদ হিসেবে গণ্য হয়।

২. প্রচলিত রিকারিং ডিপোজিট (Recurring Deposit - RD) এর শরয়ী বিধান

প্রচলিত ব্যাংকগুলোর RD বা পুনরাবৃত্ত আমানতের ক্ষেত্রেও শরয়ী বিধান না-জায়েজ (হারাম)।

পদ্ধতি: গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখে।

রিটার্ন: FD-এর মতোই, ব্যাংক জমাকৃত ক্রমবর্ধমান অর্থের ওপর একটি পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত সুদের হার ঘোষণা করে।

শরয়ী সমস্যা: যদিও RD-তে টাকা প্রতি মাসে জমা হয় এবং FD-তে একবারে জমা হয়, তবুও মূল সমস্যা একই। অর্থাৎ, মুনাফাটি পূর্বনির্ধারিত সুদের হার অনুযায়ী দেওয়া হয়, যা ইসলামী নীতির পরিপন্থী। এটিও সুদ (রিবা) হওয়ায় না-জায়েজ।

৩.৫.৪.৩ লকার (Locker) ব্যবহারের শরয়ী বিধান

ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের লকার বা সেফ ডিপোজিট বক্স (Safe Deposit Box) ব্যবহারের চুক্তিটি সাধারণত ভাড়া (Ijarah) এবং আমানত (Amanah)-এর সমন্বয়ে গঠিত।

১. ফিকহী অবস্থান (কন্ট্রাক্ট):

লকার ব্যবহারের চুক্তিকে দুটি মূল ফিকহী চুক্তির অধীনে আনা হয়:

ইজারা (Ijarah - ভাড়া):

গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য লকার ব্যবহারের সুবিধাটি ভাড়া বাবদ অর্থ পরিশোধ করে।

এই ভাড়ার চুক্তি শরীয়তসম্মত।

এই ভাড়ার বিনিময়ে ব্যাংক লকারটি ব্যবহারের জন্য একটি নিরাপদ স্থান (পরিবেশ) এবং লকার খোলার চাবি বা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

আমানত (Amanah - জিম্মাদারী):

লকারটি ব্যাংকের ভল্টের মধ্যে থাকার কারণে, ব্যাংক ওই লকারটি ও তার ভেতরে রাখা জিনিসপত্র সুরক্ষিত রাখার জিম্মাদার (আমানতদার) হিসেবে কাজ করে।

লকারের ভেতরে কী আছে: আপনার টাইপ করে দেওয়া অংশটিতে যেমন বলা হয়েছে, লকারের ভেতরের জিনিসপত্রের সাথে ব্যাংকের সরাসরি সম্পর্ক থাকে না এবং ব্যাংক কী রাখা আছে তা জানেও না।

ব্যাংকের দায়িত্ব: ব্যাংক আমানত হিসেবে শুধুমাত্র লকারটি এবং তার ভল্টটিকে চুরি, ডাকাতি বা বাইরের বিপদ থেকে যত্নসহকারে পাহারা দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ।

২. শরয়ী বিধান (বিধান):

যেহেতু লকার ব্যবহারের চুক্তিটি মূলত ভাড়া এবং সেফকিপিং (আমানত) পরিষেবা, তাই এটি নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ (হালাল):

ভাড়া পরিশোধ: লকার ব্যবহারের জন্য ব্যাংককে দেওয়া ভাড়া (সার্ভিস চার্জ) শরীয়তসম্মত।

আমানতের জিম্মাদারী: ব্যাংক ওই লকারকে আমানত হিসেবে গণ্য করে তার সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে।

ভেতরে সংরক্ষিত জিনিস:

লকারের ভেতরে কেবল হালাল (বৈধ) জিনিসপত্রই রাখা যাবে। যেমন: সোনা, রুপা, মূল্যবান গহনা, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদি।

হারাম বা অবৈধ জিনিস (যেমন: চুরি করা সম্পত্তি, নেশাজাতীয় দ্রব্য বা অবৈধ ব্যবসার টাকা) রাখলে সেই কাজ না-জায়েজ হবে।

হারাম কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ: যদি কোনো ব্যাংক লকার ব্যবহার করে সুদের লেনদেন বা অন্য কোনো হারাম কাজ করে, তবে সেই ব্যাংকে লকার নেওয়া উচিত নয়। তবে সাধারণভাবে লকার ব্যবহারের পরিষেবাটি শরীয়তসম্মত।

সংক্ষেপে: ব্যাংকের লকার সার্ভিস ব্যবহার করা জায়েজ, কারণ এটি একটি পরিষেবা যা ভাড়ার চুক্তির অধীনে পরিচালিত হয় এবং ব্যাংক জিম্মাদার হিসেবে আমানত রক্ষার দায়িত্ব পালন করে।

৩.৬ ইসলামী ব্যাংকের ধারণা

৩.৬.১ ইসলামী ব্যাংক: ইসলামি ব্যাংকিং হলো একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ইসলামি শরিয়াহ'র মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এই ব্যাংকিংয়ের পদ্ধতিতে সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ এবং এটি ন্যায়তা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বাস্তব বস্তুর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইসলামি ব্যাংকিংয়ে আর্থিক লেনদেন বাস্তব সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং সুদের পরিবর্তে লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব বা নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয় অর্জন করা হয়।

BD বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু হয় **১৯৮৩** সালে, যখন ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক। এই উদ্যোগের পেছনে ওআইসি (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন)-এর আর্থিক সহযোগিতা এবং ইসলামি ব্যাংকিং উন্নয়নে ব্যাংকের পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরপর থেকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন- আল-আরাফাহ্ ইসলামি ব্যাংক, এক্সিম ইসলামি ব্যাংক এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি বড় অংশ ইসলামি ব্যাংকিংয়ের আওতাভুক্ত।

৩.৬.২

ইসলামি ব্যাংকের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান কি মুসলিমদের ইতিহাসে ছিল?

ব্যাংকব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে বাগে আনা গেলেও মুসলিম সমাজ ছিল এর প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত। ১৮৬৭ সালেই 'ব্যাংক' সর্বাধুনিক রূপ পায় কিন্তু মুসলিম সমাজ এর আওতাভুক্ত হয় পাঁচশ বছর পরে! সেই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল বলে এমনটি হয়েছে এই ধারণা একেবারেই ভুল। ১৪০০ সাল থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি এবং প্রযুক্তিগত উন্নত রাজ্য ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্য।

তাদের দোরগোড়া ইতালিতে ব্যাংকব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্তু এত কাছে থাকা সত্ত্বেও ৪৫০ বছর তারা ব্যাংকব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি। এই সময় অর্থনৈতিকভাবে মুসলিমরা কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিল না, বরং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় আরো সমৃদ্ধ ছিল। কারণ ব্যাংকব্যবস্থা কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বাক্ষর না। এটি একটি প্রতিষ্ঠান যা হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে চলে এসেছে। ব্যাংক কোনো জাতিকে উন্নত করতে তো পারে নাই, বরং লক্ষ মানুষের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনি এর ইতিহাসের সাথে জড়িত আছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কা বিজয় (৬২৯ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু করে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু থাকা ১২৯৫ বছরের ইসলামি খিলাফতের ইতিহাসে মুসলিম সমাজ 'ব্যাংক' প্রয়োজনীয়তা তেমন একটা অনুভব করেনি। মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম যেই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম ইস্তানবুল ব্যাংক (১৮৫৬)। ব্রিটিশ, ফরাসি এবং সামান্য পরিমাণে ওসমানীয় সরকারের যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকটির কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। মূলধারার মুসলিম সমাজ এর আওতাভুক্ত ছিল না।

প্রচলিত ব্যাংকিং দ্বারা মূলধারার মুসলিম সমাজে যখন সুদের অপব্যবহার করা সম্ভব হলো না, তখন সুদকেই ইসলামি ব্যাংকিংয়ের চিন্তা শুরু হয়।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে হজ্বের টাকা জমানোর প্রয়োজনকে সামনে রেখে 'ইসলামি' ধারণার সদ্ব্যবহার পদ্ধতি শুরু হয়। ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ার 'পিলগ্রিমস সার্ভিস করপোরেশন' এই উদ্দেশ্যে সুদমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে। এই করপোরেশন কিস্তিতে টাকা জমানোর

সুযোগ দিত এবং কোনো ধরনের সুদ দিত না। খুব স্বাভাবিকভাবেই ঐ সময়ে অন্য সকল ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের সুদ দিত। তাই 'পিলগ্রিমস সার্ভিস করপোরেশনে' টাকা রাখার তুলনায় ঘরে টাকা রাখাই ছিল উত্তম পন্থা। এককথায় এই প্রকল্প বিশেষ কোনো পরিবর্তন বয়ে আনতে পারেনি।

ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রাথমিক স্থিতিশীলী প্রয়োগ করা হয়েছিল মিশরের 'মিট ঘামর' এলাকায় ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সালে। ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা ছিল জার্মান সেভিংস ব্যাংক। জার্মান ব্যাংকের সাফল্য দেখে ড. আহমদ আল নাজ্জার সেই আদলে মিশরের মিট ঘামর এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু মিট ঘামরের মানুষগুলো ছিল ধর্মভীরু মুসলিম। তারা টাকা পয়সা ব্যাংকে জমা রাখত না।
এমতাবস্থায়, এই ব্যাংকের উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জ ছিল ২ টি। মানুষকে টাকা জমানোর মর্ম বুঝানো এবং ইসলামি মূলনীতি ধরে রেখে কাজ করা। তাই তিনি মিট ঘামরের ঐ ব্যাংক ৩ ধরনের অ্যাকাউন্ট চালু করলেন— সার্ভিস অ্যাকাউন্ট, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ও জাকাত অ্যাকাউন্ট।

১। যারা টাকা জমা রাখত সার্ভিস অ্যাকাউন্টে, তাদেরকে কোনো ধরনের সুদ বা উপকার দেওয়া হতো না, কিন্তু তারা যখন চাইত তখন টাকা তুলতে পারত। (তবে তারা ছোট ও স্বল্পমেয়াদি সুদবিহীন ঋণ নিতে পারত ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য)।

২। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া টাকা তোলার ব্যাপারে একটু কড়া নিয়ম ছিল, চাইলেই তোলা যেত না এবং সেই টাকা শরিয়াহ্ অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হতো।
৩। জাকাত অ্যাকাউন্টের টাকা শরিয়া নিয়ম অনুযায়ী গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো।

প্রথম চালু করা এরকম ব্যাংক ৪ বছরে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যাপক সাফল্য পেয়ে যায়। ২৫ হাজার মিশরীয় পাউন্ড থেকে তাদের সার্ভিস এই সময়ে বেড়ে ৭৫ হাজারে উন্নীত হয়। আর একই সময়ে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টগুলোয় জমা হওয়া টাকার পরিমাণ ৩৫ হাজার মিশরীয় পাউন্ড থেকে বেড়ে ৭৫ হাজারে উন্নীত হয়। ব্যাংকটির ব্যাপারে এরকম মন্তব্য করা হয় যে তারা অনেক সতর্ক অবস্থায় কাজ করেছিল। ফলে, প্রথম ৩ বছরে ৬০% ঋণের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল।

ড. আহমদ আল নাজ্জারের তৈরি করা এই 'মিট ঘামর ব্যাংক' বিভিন্ন কারণে দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রকল্পটি ছিল সবার কাছে খুবই আগ্রহের এবং এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

৩.৬.৩ আধুনিক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা কীভাবে তৈরি হলো:

মিট ঘামরের প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ার পর ইসলামি ব্যাংক চালু করার ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে আলোচনা আসতে থাকে। তবে সেই মডেলকে অনুসরণ না করে এবার আধুনিক ব্যাংকিংয়ের আদলেই ইসলামি ধরনের ব্যাংক বানানোর চেষ্টা চলতে থাকে। অর্থাৎ, আধুনিক ইসলামি ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা লাভজনকতায়, ব্যবস্থাপনায়, নীতিমালায় এবং কাঠামোতে প্রচলিত ব্যাংকের মতোই। শুধু ঋণ আদান-প্রদানটি হয় বাহ্যত শরিয়া আইনে।

পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও বিশ্বব্যাংকের (World Bank) যৌথ কর্মসূচি "Structural Adjustment Programme"-এর আওতায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা চালু করার কাজ আরম্ভ হয়।

এই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে সৌদি আরবের রাজধানী জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে লাহোর সম্মেলনে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে এবং সেই বছরই জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে ‘ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক’ (আইডিবি) চার্টার গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার ‘ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক’-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সেই চার্টারে স্বাক্ষর করে।

১৯৭৫ সালে সৌদি আরবে ‘ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক’ যাত্রা শুরু করে এবং ঐ বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে ‘দুবাই ইসলামি ব্যাংক’ নামে একটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে আইডিবির হাত ধরেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামি ব্যাংক দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, পাকিস্তান, ইরান, সুইজারল্যান্ড, আম্মান, জর্ডান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু হয়।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আইডিবি'র একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসে বেসরকারিভাবে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিবন্ধিত হয়।
এই দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পকে সংগঠিত করার জন্য, ১৯৯০ সালে অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং সংস্থা (AAOIFI) খোলা হয়। ১৯৯৬ সালে ইথিওপিয়া নিয়ন্ত্রিত সিটি ব্যাংকও ইসলামি ব্যাংকিং বিভাগ চালু করে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলো শীঘ্রই এই পথ অনুসরণ করে।

৩.৬.৪ ইসলামি ব্যাংক যেভাবে ঋণ দেয়

একটি প্রচলিত ব্যাংক যখন ঋণ দেয় তার আগে সে গ্রাহকের থেকে সব ধরনের কাগজপত্র জমা চায়, যেমন- আয়-রোজগারের হিসেব, ট্যাক্সের বিবরণ, সম্পত্তির হিসেব ইত্যাদি। এই কাগজপত্রগুলো দেখে ব্যাংক গ্রাহকের ঋণ গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-বাছাই করে। তারপর, জামানতের (সম্পত্তির) বিপরীতে ঋণ ইস্যু করে। এতোটুকুন পর্যন্ত একটি ইসলামি ব্যাংক এবং একটি প্রচলিত ব্যাংকের নীতি একই।
ঋণ অনুমোদনের পর যখন টাকা দেওয়ার সময় আসে, একটি প্রচলিত ব্যাংক গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকাটা পাঠিয়ে দেয়, তারপর সে শর্ত জুড়ে দেয়, "সুদে আসলে এই টাকা দ্বিগুণ করে আমাকে ফেরত দেবেন। আপনাকে পাঁচ বছর সময় দিলাম।"

ঠিক একই উদ্দেশ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলোর কাছে আপনি যখন ঋণ নিতে যান, তখন তারা বলবে, "ঋণের টাকায় কী করবেন, জানতে পারি?" আপনি হয়তো বলবেন, "ব্যবসা করব; কিংবা, দোকানে নতুন মাল-পত্র তুলব।" ইত্যাদি।" ইসলামি ব্যাংকগুলো তখন বলবে, "আপনার ব্যবসা করতে যত প্রকার মাল-পত্র লাগে আমি সব কিনে দিচ্ছি। কিন্তু শর্ত হচ্ছে দ্বিগুণ দামে আমার থেকে কিনতে হবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে টাকাটা ফেরত দিতে হবে।"

মোদ্দাকথায়, আপনি যখন ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নিতে প্রচলিত ব্যাংকের কাছে যান, তারা আপনার অ্যাকাউন্টে ৫০ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে পাঁচ বছরে এক কোটি টাকা ফেরত চাইবে (বছরে ২০ লক্ষ টাকা করে) এবং আপনি যখন একটি ইসলামি ব্যাংকের কাছে যান, তারা আপনার কাছে ৫০ লক্ষ টাকার পণ্য ১ কোটি টাকায় বিক্রি করবে। তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে ১ কোটি টাকা ফেরত চাইবে (বছরে ২০ লক্ষ টাকা করে)।

সুচিন্তিত পাঠক মনে মনে ভাবতে পারেন, সামান্য কিছু নিয়ম-কানুনের কারসাজি ছাড়া এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?
ইসলামি ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, অন্যান্য ব্যাংক যেখানে 'কাঁচা টাকা' ঋণ দিয়ে বাড়তি টাকা ফেরত নিচ্ছে (বা সুদ গ্রহণ করছে) সেখানে ইসলামি ব্যাংকগুলো পণ্য বা সেবা উচ্চমূল্যে বিক্রি করে একই সমান টাকা লাভ হিসেবে ফেরত নিচ্ছে (ব্যবসা করে)। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ হারাম এবং ব্যবসা হালাল। তাই ইসলামি ব্যাংক হালাল, কিন্তু বাকি সব ব্যাংক হারাম।

৩.৬.৫ ইসলামি ব্যাংকের ব্যবসা কাঠামো বিশ্লেষণ

সাদা চোখে ইসলামি ব্যাংকের এই কথাগুলো খুব বাস্তবসম্মত মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে ইসলামি ব্যাংকগুলো কোনো শরিয়া আইন ভঙ্গ করে নাই। তাই পৃথিবীর সবচাইতে ব্যাংক-কে ইসলামি ব্যাংক বানিয়ে দিলে সুদমুক্ত বিশ্ব নির্মাণ করা সম্ভব।
কিন্তু এখানে শক্ত কিছু অভিযোগ আছে।

মনেকরি, কেও একজন ব্যাংক থেকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ নেবে গাড়ি কেনার জন্য, কিন্তু ইসলামে সুদ হারাম হওয়ায় ঋণ দিয়ে বাড়তি টাকা ফেরত নেওয়াটাও জায়েজ নাই। তাহলে কী করা যায়, ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে বলল আমরা গাড়ি কিনে দিই, প্রতিবছরে ৬ লক্ষ করে ৫ বছরে মোট ৩০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে দিয়েন।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে ওই ব্যক্তি কেন ২০ লক্ষ টাকার গাড়ি ৩০ লক্ষ টাকায় কিনে নেবে? উত্তর হচ্ছে, ঋণ নেওয়ার জন্য। বাজারে চলমান সুদের হারে কেও ২০ লক্ষ টাকা ঋণ নিলে ৫ বছরে দেড়গুণ হারে ফেরত দিতে হয়। তবে ব্যাংক যেহেতু এই কাজটা সরাসরি করতে পারছে না, তাই ২০ লক্ষ টাকার গাড়ি ৩০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে টাকাটা ফেরত নিলেন! এটাই ইসলামি ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সর্বব্যাপি পদ্ধতি!

লাভের দিক দিয়েই যে শুধু ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকের মতো তা না, ঝুঁকির দিক দিয়েও ইসলামি ব্যাংকগুলো। অন্যান্য ব্যাংকের মতো।

৩.৭ আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ফাঁদসমূহ

৩.৭.১ আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে?

আমাদের অনেকের মাঝেই এই ভুল ধারণা কাজ করে যে ব্যাংক আমাদের টাকা জমা রাখে। ধারণাটি বেশ ভালোভাবে ভুল। ব্যাংকে কারো টাকা জমা থাকে না। এটি একটি ঋণ আদান-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক একজনের থেকে ঋণ নিয়ে অন্যজনকে তা দেয়। আমরা যখন ব্যাংকে টাকা রাখি, তখন আমরা মূলত ব্যাংক-কে ঋণ দেই। এজন্যই ব্যাংক আমাদেরকে সুদ দেয়। আবার ব্যাংক থেকে আমরা যখন ঋণ নেই তখন ব্যাংক আমাদেরকে ঋণ দেয়। এজন্যই আমরা ব্যাংক-কে সুদ প্রদান করি। এই 'লোন' এবং 'ডিপোজিটে'র সুদের পার্থক্যই ব্যাংকের লাভ।

আপনি হয়তো ব্যাংকের লকার সেবার নাম শুনেছেন। এই সেবার আওতায় আপনি কিছু নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ব্যাংকের লকারে জমা রাখতে পারেন। ব্যাংক এই লকারগুলো আলাদা করে তৈরি করে এবং নিরাপদে সবকিছু সুরক্ষিত রাখে। আমরা যদি এখানে টাকা বা স্বর্ণ-গহনা রাখি তাহলে নিরাপত্তার মূল্য হিসেবে আমাদেরকে সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। কারণ, লকারে রাখা বস্তু ব্যাংক কাউকে ঋণ দেয় না। এমনকি ব্যাংক যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলেও আপনি আপনার জিনিস তুলে আনতে পারবেন। কারণ, আমানতদাতা কোনো ঝুঁকি বহন করে না।

সে তুলনায় ঋণদাতার কোনো ঝুঁকি থাকে না। তাই ব্যাংক যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, আপনি ডিপোজিটের টাকা ফেরত পেতে পারেন, নাও পেতে পারেন। তবে ব্যাংক ডিপোজিট সাধারণত সরকার কর্তৃক বীমা করা থাকে। তাই সরকার এই টাকাটা দিয়ে দেয়।

সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ব্যাংকে টাকা রাখা মানে ব্যাংক-কে ঋণ দেওয়া। এই ঋণের ধরনের বিপরীতে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের ধরন অনুযায়ী সুদের হার নির্ধারিত হয়। যেমন: ফিক্সড ডিপোজিটে ৫% বা ৭% সুদ, সেভিংস অ্যাকাউন্টে ৪% সুদ এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ০% সুদ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এই টাকা “কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে” ব্যাংক অন্যদের ঋণ দেয় এবং মোটা অঙ্কের লাভ করে।

সকল ব্যাংকই এই কাঠামো অনুসরণ করে, তবে ঋণ আদান-প্রদানের বেলায় তাদের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

৩.৭.২ আধুনিক ব্যাংকের হাতিয়ার

এখন বলি আধুনিক ব্যাংকিং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী হাতিয়ার নিয়ে। সেটা হলো 'টাকা তৈরি' করা। এটা একটা ঐতিহাসিক টপিক বলা যায়। কারণ এই সমস্যাটির সমাধান করতে গিয়ে বাধ্য বাধ্য অর্থনীতিবিদেরা বলছেন যে পুরো ব্যাংক সিস্টেম পরিবর্তন করা উচিত। সেই ভয়ানক সমস্যাটার নাম হচ্ছে, 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'।

এই সম্পর্কে অনেকখানি ইতিমধ্যেই পড়লেন আমার সাথে। চলুন আরেকটা পড়ি। দুইটা জিনিস আছে একটা হলো 'ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং' আর আরেকটা হলো 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'।

ধরুন: আপনার কাছে ১০০ টাকা আছে। আপনি আপনার কাজের জন্য ২০ টাকা সরিয়ে রেখে বাকি ৮০ টাকা আপনার বন্ধুকে ঋণ দিলেন কাজে লাগানোর জন্য। এই, ৮০ টাকা, সেটার সম্পূর্ণ মালিক আপনি এবং এর কিছু অংশ ঋণ দিলেন, এটাকে বলে 'ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং'।

এবার ধরুন, আপনার কাছে ১০০ টাকা আছে। আপনি আপনার কাছের ৪ জন বন্ধুকে বললেন, আমি তোদেরকে ১০০ টাকা করে দিব, যা ইচ্ছা করিস। এই ৪ বন্ধু ৪০০ টাকা খরচের লাইসেন্স পেয়ে গেল, কিন্তু আপনার কাছে আছে মাত্র ১০০ টাকা। এই সিস্টেমটাকে বলে 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'। অর্থাৎ এমন একটা টাকা আপনি বানালেন, যেটার মালিক আপনি না! কিন্তু আপনি আসলে সেই বানানো টাকা সুদে ঋণ দিচ্ছেন!!!

আধুনিক ব্যাংকিং এখন চলছেই 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং' নীতিতে। কোনো কোনো দেশ ২৫% কিংবা ১০% 'Required Reserve Ratio' সেট করে রেখেছে {}^{২৪}। এই Ratio যত কম হবে, সেই দেশের ব্যাংক ততবেশি টাকা বানিয়ে ঋণ দিতে পারবে। বাংলাদেশের এই হার হচ্ছে মাত্র ৫%, অর্থাৎ কোনো ব্যাংকে কেউ ১০০ টাকা জমা রাখলে, সেই ব্যাংক ২০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারবে, প্রায় ২০ গুণ! বাংলাদেশের ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ ছিল প্রায় ১২ লাখ কোটি টাকা। এবার, ৫% 'Required Reserve Ratio' অনুযায়ী এই ১২ লাখ কোটির ২০ গুণ ঋণ দিলে কি অর্থ দাঁড়াবে?

আচ্ছা, সুদ ইসলামে হারাম, এটা আমরা সবাই খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করেছি। এখন, এই 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং' এ আমার কাছে ১০০ টাকা থাকলে আইনের মারপ্যাঁচে এই ১০০ টাকার বেশি ঋণ দেওয়া কি শরিয়া অনুমোদন করে?

সরল উত্তর হচ্ছে: না, শরিয়া অনুমোদন করে না।

বাড়তি এই হাওয়া থেকে আসা টাকা, যে টাকার মালিক ব্যাংক না বা কেউই এর মালিক না, শুধু ব্যাংকিং সিস্টেমের আইনের কারণে এই টাকাটা সৃষ্ট হওয়ার এমন কোনো নীতি পাওয়া যায় না, যার উপর ভিত্তি করে পুরো বিষয়টাকে 'হালাল' বলা যায়। গবেষকরা জগতে যারাই ইসলামি অর্থনীতি, ফাইনান্স ও ব্যাংকিং নিয়ে পড়াশোনা করে, তারাই বলেন যে এটা মোটেই শরিয়া সম্মত পদ্ধতি না।

এমনকি বিশ্বের সকল ইসলামি ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইসলামি উইং/শাখগুলোর নীতিনির্ধারকরা এই ব্যাপারটি জানে। বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংক তাদের নিজেদের ওয়েবসাইটে 'Issues And Problems of Islamic Banking' শীর্ষক ওয়েবপেজের 'Credit Creation and Monetary Policy' সেকশনে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে এবং সেখানে তাদের মতামতের সারমর্ম ছিল,

"In summary, according to the principle of Islamic banking, private banks should not have the power to create money, that money creation should be a power reserved for the government or its central bank."

৩.৭.৩ ব্যাংক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

১. ঋণ প্রদানে বৈষম্য (Inequality in Lending)

অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্যাংকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে:

ধনীদের অগ্রাধিকার: ব্যাংকগুলো সাধারণত বৃহৎ শিল্পপতি ও ধনী গোষ্ঠীকে ঋণ দিতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। কারণ তাদের জামানত (collateral) এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা (credit-worthiness) বেশি থাকে। এতে ধনীরা আরও বেশি মূলধন পায় এবং দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে।

দরিদ্রদের ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা: দরিদ্র বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাধারণত পর্যাপ্ত জামানত বা আয়-রোজগারের আনুষ্ঠানিক রেকর্ড থাকে না। ফলে তারা প্রচলিত ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে ব্যর্থ হয়।

ঋণের শর্তে বৈষম্য: যদি দরিদ্ররা ঋণ পায়ও, অনেক সময় তাদের উচ্চ সুদের হার বা কঠিন শর্তের সম্মুখীন হতে হয়, যা তাদের ঋণ পরিশোধের বোঝা বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের দরিদ্রতা দূর করতে বাধা দেয়।

২. সঞ্চয় ও সুদের হার (Savings and Interest Rates)

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা যায়:

সুদের সুবিধা: ব্যাংকের প্রদত্ত সুদের সুবিধা সাধারণত সেইসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বেশি পায়, যাদের বড় অঙ্কের সঞ্চয় থাকে। ধনীরা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যাংকে বিনিয়োগ করে সহজে অতিরিক্ত আয় করতে পারে, যা তাদের সম্পদকে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়ে তোলে।

দরিদ্রের অল্প সঞ্চয়: দরিদ্র বা নিম্ন আয়ের মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় তারা সুদের সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত থাকে। এমনকি অনেক সময় মূল্যস্ফীতির কারণে তাদের সামান্য সঞ্চয়ের মূল্যও কমে যায়।

৩. আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভাব (Lack of Financial Inclusion)

অনেক মানুষ এখনও ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে রয়েছে, যা বৈষম্য বাড়ায়:

গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল: গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা বা এজেন্ট আউটলেটের অভাব রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবও এই সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। ফলে এই অঞ্চলের মানুষ ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী: বিশেষ করে নারী, শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এবং আর্থিক অবস্থা দুর্বল জনগোষ্ঠী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। ফলে তারা সরকারের বা ব্যাংকের দেওয়া আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং সমাজের মূল অর্থনৈতিক স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

৪. নীতি ও তদারকিতে দুর্বলতা (Weakness in Policy and Supervision)

অনেক সময় ব্যাংকিং নীতির দুর্বলতা এবং তদারকির অভাবে বৈষম্য তৈরি হয়:

খেলাপি ঋণ: ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রাষ্ট্রায়ত্ত বা বেসরকারি ব্যাংক থেকে অবাধে ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দিলে সেই ঋণের বোঝা শেষ পর্যন্ত সাধারণ আমানতকারী এবং জনগণের ওপরই বর্তায়। এই খেলাপি ঋণ প্রথা দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত বৈষম্যকে আরও তীব্র করে।

করপোরেট কর ছাড়: প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ধনীদের অনুকূলে বিভিন্ন করপোরেট করছাড় দেওয়া হয়, কিন্তু রাজস্ব আয়ের বেশিরভাগই আসে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে পরোক্ষ করের মাধ্যমে, যা বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করে।

৩.৭.৪ ইসলামী ব্যাংকের ফাঁকি

প্রচলিত ব্যবসা মুরাবাহা, বায়-মুয়াজ্জাল, লিজির ইত্যাদি এক নয়। আপনার এলাকার পরিচিত মুদি দোকান থেকে কিছু কেনার পর আপনি যখন দোকানদারকে বলেন, "ভাই রে, এই মাসে হাতে কোনো টাকা নেই। তুই সামনের মাসে ভাইয়ের থেকে টাকাটা নিয়ে নিস।" এটা হচ্ছে বায়-মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়) লেনদেন।

তাহলে ব্যাংক যে গুদাম বা দোকান ছাড়াই সবকিছু বিক্রি করে ফেলছে সেইটা কী? এই ব্যাপারে জানতে চাইলে ইসলামি ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বলেন, "আগের যুগের মুরাবাহা, বায়-মুয়াজ্জাল এবং আধুনিক ব্যাংকিং মুরাবাহা ও বায়-মুয়াজ্জাল এক নয়। আমরা এখন দোকানের মতো পণ্য সাজিয়ে না রেখেও চুক্তিভিত্তিক লেনদেন করে সব ব্যবসা করে ফেলতে পারি।"

দুইটি বস্তু এক নয় । কিন্তু আধুনিকতার নামে ব্যাংকিং এবং ব্যবসা এক হয়ে যাচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর জানাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল করে দেখুন, ব্যাংক একজন প্রচলিত ব্যবসায়ীর মতো ঝুঁকি বহন করে না। গাড়ি ব্যবসায়ীর কথাই যদি চিন্তা করেন, তিনি ফ্যাক্টরির থেকে গাড়ি কিনে দোকানে সাজিয়ে রাখেন, ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করেন, পণ্য চুরি হওয়ার আশঙ্কা করেন, আগুন লাগার ব্যাপারেও ভয়ে থাকেন, আরো কত কী! সেই তুলনায় একটি একটি ব্যাংক মাল বিক্রি নিশ্চিত করেই মাল অর্ডার করে আর মালিকানা হাতে আসার সাথে সাথে ত্বরিত গতিতে মালিকানা পরিবর্তন করে ফেলে। ঝুঁকি বলতে থাকে কেবল টাকা ফেরত না পাওয়া। কিন্তু অন্য সব ব্যাঙ্কেরই এই ঝুঁকি থাকে।

এবার একবার ভাবুন তো, এত ঝুঁকি নিতে এত লাভজনক কোনো ব্যবসা যদি পৃথিবীতে থাকত, সবাই কি এই ব্যবসায় করত না? কিন্তু সবাই কেন করে না? করে না কারণ এটা কোনো ব্যবসাই না। এখানে কেবল ঋণ আদান প্রদান হচ্ছে। ব্যবসার নাটকটা করা হচ্ছে সুদকে হালাল বানানোর উদ্দেশ্যে। ঋণ দাতা কিংবা ঋণ গ্রহীতা কারোরই ব্যবসা করার নিয়ত নেই। কিন্তু আল্লাহ্‌ যেহেতু ব্যবসা হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম তাই আল্লাহর আইন অনুযায়ী পবিত্র থাকার জন্য ব্যবসা করার নাটক সাজানো হয়েছে; এজন্যই একটি প্রচলিত ব্যাংকের মডেলের সাথে আমরা যখন কোনো ইসলামি ব্যাঙ্কের মডেলের তুলনা করি, সামান্য কিছু প্রক্রিয়াগত তফাত ছাড়া আর কোনো তফাতই নজরে পড়ে না। কিন্তু একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যখন আমরা ইসলামি ব্যাঙ্কের তুলনা করি, তখন কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া

যায় না। এই মুহূর্তে অনেকে অভিযোগ করতে পারেন, মুরাবাহা ও বায়-মুয়াজ্জাল ছাড়াও ইসলামি ব্যাঙ্কের আরো কিছু সংখ্যক ব্যবসা মোড আছে। তাই মুরাবাহা যদিও বাহানা হয়। ইসলামি ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ বাহানা না।

অধ্যায় – ৪ - সুদের ভয়াবহ প্রভাব ও মানবজীবনে দাসত্বের নমুনা (The Devastating Effects of Interest and Examples of Slavery in Human Life)

৪.১ আর্থিক দাসত্বের ধারণা:

৪.১.১। ব্যক্তি জীবনে সুদের অর্থনৈতিক প্রভাব:

সুদ যখন কোনো ব্যক্তি ঋণ নেয় (যেমন ব্যক্তিগত ঋণ, গৃহঋণ, ক্রেডিট কার্ড ঋণ), তখন তার জীবনে সরাসরি অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে:

ঋণের খরচ বৃদ্ধি: সুদের হারের কারণে ঋণগ্রহীতাকে মূল টাকার (আসল) চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয়, যা তার ঋণের মোট খরচ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে এই বোঝা আরও বাড়ে।

আর্থিক চাপ ও ঋণের ফাঁদ: উচ্চ সুদের হার মাসিক কিস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, যা ঋণগ্রহীতার মাসিক বাজেট এবং দৈনন্দিন খরচে চাপ সৃষ্টি করে। দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের মানুষজন সুদের এই চক্রে একবার পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে যায়, যা ঋণ-দাসত্বের জন্ম দিতে পারে।

ভোগের হ্রাস: ঋণের কিস্তি পরিশোধে আয়ের একটি বড় অংশ ব্যয় হওয়ায়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বা ঐচ্ছিক খরচ (ভোগ) হ্রাস পায়।

সম্পদের ক্ষয়: সুদের কারণে অনেক সময় মানুষজন তাদের সম্পদ (জমি, গহনা ইত্যাদি) বিক্রি বা বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়।

মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয়: ঋণের বোঝা মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরি করতে পারে।

৪.১.২। সমাজ জীবনে সুদের প্রভাব:

সমাজ জীবনে সুদের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং সাধারণত নেতিবাচক। এটি কেবল ব্যক্তিগত আর্থিক লেনদেন নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক কাঠামো, নৈতিকতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে।

এখানে সমাজ জীবনে সুদের প্রধান প্রভাবগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো:

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি

সুদ সমাজের সবচেয়ে বড় বৈষম্য সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম:

সম্পদের কেন্দ্রীকরণ: সুদভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে সম্পদ একটি ক্ষুদ্র ধনী গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয় (যারা ঋণদাতা বা ব্যাংকের মালিক)। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষ এবং ছোট ব্যবসায়ীরা ঋণের বোঝা ও উচ্চ সুদের চাপে পিষ্ট হয়।

আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতা: ধনীরা সুদের মাধ্যমে সহজে অতিরিক্ত আয় করতে পারে, যখন দরিদ্ররা তাদের আয়ের বড় অংশ সুদ পরিশোধে ব্যয় করে। এটি অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে মারাত্মকভাবে নষ্ট করে, যা সামাজিক অস্থিরতা বাড়ায়।

দারিদ্র্যের স্থায়ী চক্র: দরিদ্র ব্যক্তিরা সাধারণত উচ্চ সুদের হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তারা আরও দরিদ্র হয় এবং ঋণের ফাঁদে (Debt Trap) পড়ে যায়, যা দারিদ্র্যকে বংশপরম্পরায় স্থায়ী করে তোলে।

উৎপাদন ও বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব

সুদ কখনও কখনও উৎপাদনশীলতা এবং সুস্থ অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে ব্যাহত করে:

ঝুঁকিবিহীন লাভের প্রবণতা: সুদের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি না নিয়েই একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে তারা উৎপাদনশীল, ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু জনকল্যাণমূলক শিল্প বা ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে সহজেই টাকা ধার দিতে উৎসাহিত হয়।

অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ: অনেক সময় ব্যক্তিগত ঋণ বা ভোগ্যপণ্য কেনার জন্য নেওয়া ঋণ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয় না। এর ফলে সমাজে নতুন কোনো সম্পদ সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সুদ ঠিকই বাড়তে থাকে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধীর করে দেয়।
কৃত্রিম মূল্যস্ফীতি (Inflation): ব্যবসায়ীরা যখন ব্যাংক থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে পণ্য উৎপাদন করে, তখন ঋণের সুদ পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে যোগ হয়। এর ফলে বাজারে সেই পণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং সাধারণ ভোক্তাদের (সমাজের সবাই) সেই অতিরিক্ত মূল্য বহন করতে হয়।

মানবিকতা ও নৈতিকতার অবক্ষয়

সুদের প্রথা সমাজে মানবিক সম্পর্ক ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে:
সহযোগিতার অভাব: সুদের প্রথা মানুষকে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করা বা কর্জ হাসানা (সুদমুক্ত ঋণ) দেওয়ার মানসিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সবাই কেবল মুনাফা লাভের দিকে মনোযোগ দেওয়ায় সামাজিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ কমে আসে।
লোভ ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি: সুদভিত্তিক লেনদেন মানুষের মধ্যে দ্রুত ধনী হওয়ার এবং অন্যের প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে অর্থ উপার্জনের প্রবণতা সৃষ্টি করে, যা সামাজিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ন করে।

শ্রমের মর্যাদাহানি: সমাজে এমন ধারণা তৈরি হয় যে অর্থ কেবল শ্রমের মাধ্যমে নয়, বরং টাকার বিনিময়ে আরও টাকা (সুদ) দিয়েই উপার্জন করা যায়, যা কঠোর পরিশ্রম ও সৎ উপার্জনের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়।

সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধি

সুদের অর্থনৈতিক চাপ থেকে সৃষ্ট হতাশা সমাজে অপরাধ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে:

আত্মহত্যা ও পারিবারিক ভাঙন: ঋণের বোঝা ও পাওনাদারদের চাপ সইতে না পেরে অনেক সময় মানুষ হতাশ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বা পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয়।
অবৈধ কার্যকলাপ: ঋণের চাপ থেকে মুক্তি পেতে বা দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য অনেকে অবৈধ বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৪.১.৩ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে সুদের প্রভাব:

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে সুদের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।

মূল্যস্ফীতি (Inflation) বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতা

কৃত্রিম মূল্যস্ফীতি: যদিও সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সুদভিত্তিক ব্যবস্থার কারণে উৎপাদিত পণ্যের খরচ বাড়ে। ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে উৎপাদন করলে, সুদের খরচ পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়। এর ফলে বাজারে পণ্যের দাম কৃত্রিমভাবে বেড়ে যায়।

নীতিগত ব্যর্থতা: অনেক সময় দেখা যায়, কেবল সুদের হার বাড়ানো সত্ত্বেও যোগান-জনিত কারণে বা কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে না। উচ্চ সুদের হার একদিকে প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।

২. অর্থনৈতিক মন্দা (Recession) এবং প্রবৃদ্ধি হ্রাস

বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়, তখন ব্যবসার জন্য ঋণ নেওয়া ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগ কমে যায়। নতুন শিল্প স্থাপন বা বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণের মতো পদক্ষেপগুলো বাধাগ্রস্ত হয়।

সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস: উচ্চ সুদের কারণে মানুষ ভোগ্যপণ্য কেনার জন্য ঋণ নিতে নিরুৎসাহিত হয় এবং মাসিক কিস্তি পরিশোধে আয়ের বড় অংশ চলে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে বাজারে ভোগ বা চাহিদা কমে যায়।

মন্দার ঝুঁকি: বিনিয়োগ এবং চাহিদা—উভয়ই কমে গেলে, অর্থনীতিতে উৎপাদন হ্রাস পায়, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক মন্দার (Recession) ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং কর্মসংস্থান কমে যায়।

৩. সরকারি ঋণের বোঝা বৃদ্ধি

ঋণ পরিশোধের খরচ বৃদ্ধি: সুদের হার বৃদ্ধি পেলে সরকারের নেওয়া অভ্যন্তরীণ ঋণের (যেমন, ট্রেজারি বিল ও বন্ড) ওপর সরকারকে বেশি সুদ দিতে হয়। এর ফলে সরকারের ঋণ পরিশোধের খরচ বহুগুণে বেড়ে যায়।

বাজেট ঘাটতি: সুদের পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় হওয়ায় সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অবকাঠামো উন্নয়নের মতো উন্নয়নমূলক খাতগুলোতে বরাদ্দ কমাতে হয়। এতে বাজেট ঘাটতিও বাড়তে পারে।

৪. আন্তর্জাতিক পুঁজির অস্থিরতা

পুঁজির প্রস্থান (Capital Flight): দেশের অর্থনীতি বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হলে, সুদের হার স্থিতিশীল না থাকলে বা লাভজনক না মনে করলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা (Foreign Investors) দ্রুত তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। এই পুঁজির বহির্গমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি করে এবং বিনিময় হারকে দুর্বল করে দেয়।

৪.২ সামাজিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব

সুদের (Interest) কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্তর্জাতিক ঋণের সুদ, ব্যাংক সুদ, বাণিজ্যিক সুদ—সব মিলিয়ে একটি দেশ দীর্ঘমেয়াদে ঋণের ফাঁদে পড়ে যায়।

৪.২.১. ঋণের ফাঁদে আটকে পড়া

উন্নয়নশীল দেশগুলো সাধারণত উন্নয়ন কাজ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ঋণ নেয়।
কিন্তু সুদের হার বেশি হওয়ায়—

১। ঋণের মূল টাকা থেকেও সুদের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়'

উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন বড় অংকের বিদেশি ঋণ নেয়, সাধারণত সেই ঋণের সুদের হার তুলনামূলক বেশি থাকে। সময় যত দীর্ঘ হয়, সুদের পরিমাণ তত বেশি জমতে থাকে।

উদাহরণ:
ধরা যাক একটি দেশ ১০০ কোটি টাকা ঋণ নিল, সুদের হার ৮% এবং মেয়াদ ১৫ বছর।
১৫ বছর শেষে সুদ জমে দাঁড়াতে পারে ১০০–১৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত—
অর্থাৎ, মূল টাকার সমান বা তার থেকেও বেশি।

এর মানে:
দেশকে আসল টাকা শোধ করার আগেই শুধু সুদ শোধ করতেই বাজেটের বড় অংশ খরচ হয়ে যায়।
ফলে মূল ঋণ কমে না, বরং স্থির থাকে বা আরও বাড়ে।

২। ২. 'Debt Trap' (ঋণের ফাঁদ) — ব্যাখ্যা

Debt Trap হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে দেশ পুরোনো ঋণের সুদ পরিশোধ করতে করতে আবার নতুন ঋণ নিতে বাধ্য হয়।
ফলে ঋণ কমার বদলে আরও বাড়তে থাকে।
কেন এটাকে "ফাঁদ" বলা হয়?
কারণ—
আগের সুদ শোধ করতে নতুন ঋণ।

নতুন ঋণের ওপর আবার আরও সুদ।

সুদ শোধ করতে বাজেট কমে যাওয়া।

উন্নয়ন থেমে যাওয়া।

একই চক্র বারবার হতে থাকা।

এক পর্যায়ে দেশ এমন অবস্থায় যায়, যেখানে নিজের আয়ের বড় অংশ শুধু সুদ দেওয়াতেই খরচ হয়ে যায়।
ফলে যে কাজের জন্য ঋণ নেওয়া হয়েছিল—সেগুলোও থেমে যায় বা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

৪.২.২. উন্নয়নমূলক বাজেট সংকুচিত হয়ে যায়

দেশের বাজেটের বড় অংশ চলে যায় ঋণের সুদ পরিশোধে।
ফলে কমে যায়—

শিক্ষা
স্বাস্থ্য
কৃষি
দারিদ্র্য দূরীকরণ

কর্মসংস্থান
এক কথায়, মানুষের মৌলিক সেবার জন্য বরাদ্দ হ্রাস পায়।

৪.২.৩ দারিদ্র্য ও বৈষম্য বৃদ্ধি

সুদের কারণে—

ধনী আরও ধনী

গরিব আরও গরিব
হয়।

কারণ:
ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদ ভিত্তিক হওয়ায় “সম্পদ” উপরের দিকে কেন্দ্রিভূত হয় কিন্তু নিচের শ্রেণি ঋণ, কিস্তি, মাইক্রোক্রেডিট সুদের চাপে ভেঙে পড়ে।

৪.২.৪. উৎপাদনশীল খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়

উচ্চ সুদের কারণে—

ব্যবসায় বিনিয়োগ কমে যায়
উদ্যোক্তারা ব্যাংক ঋণ নিতে চায় না
ছোট ও মাঝারি ব্যবসা (SMEs) বন্ধ হয়ে যায়
কর্মসংস্থান কমে যায়

ফলে দেশের GDP বৃদ্ধির গতি মন্থর হয়ে যায়।

৪.২.৫ মূল্যস্ফীতি ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি

উচ্চ সুদের কারণে পুঁজির খরচ বাড়ে, এবং এই খরচ ব্যবসায়ীরা বাজারে মূল্য বাড়িয়ে পুষিয়ে নেয়।

ফলে—

দ্রব্যমূল্য বাড়ে

সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়

জীবনযাপনের ব্যয় বেড়ে দারিদ্র্য বাড়ে।

৪.২.৬ বৈদেশিক সুদের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি

উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন ডলার বা বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেয়, সুদও বিদেশে পাঠাতে হয়। এতে—

বৈদেশিক রিজার্ভ কমে
আমদানি সংকট হয়
মুদ্রার মান পড়ে যায়
অর্থনীতি অস্থির হয়ে পড়ে।

৪.২.৭ রাজনৈতিক ও সার্বভৌমত্বের ঝুঁকি

যেসব দেশের ঋণ ও সুদ বেশি হয়, তারা আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
এর ফলে—

নীতিনির্ধারণে স্বাধীনতা হারায়

IMF, World Bank ইত্যাদির শর্ত মেনে চলতে বাধ্য হয়

রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুর্বল হয়

এটাই “Debt-Driven Neo-Colonialism”.

৪.৩ ইসলামিক দৃষ্টিকোণ হতে সুদের পরিণতি:

৪.৩.১ পরকালীন পরিণতি:

১।জাহান্নামে স্থায়ী আবাস

সুদখোরদের জন্য চূড়ান্ত শাস্তি হল জাহান্নাম। আল্লাহ তায়ালা সরাসরি সুদখোরদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন।

২। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লানত (অভিশাপ)

সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লিখক ও সাক্ষী সবাই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত এবং লানতের অধিকারী।

৩। কবরের শাস্তি

সুদখোর মৃত্যুর পরপরই কবরের শাস্তি ভোগ করতে শুরু করে। হাদীসে এসেছে, সুদখোরকে কবরে এমন ভয়াবহ শাস্তি দেওয়া হবে যা অন্য কোনো গুনাহগারের তুলনায় বেশি কঠিন।

৪। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা

কিয়ামতের দিন সুদখোরকে পাগল হিসেবে উঠানো হবে, যেন সবাই বুঝতে পারে সে দুনিয়ায় কী পরিমাণ পাপ করেছে।

৫। জান্নাত থেকে চিরবঞ্চনা

সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে।

৬। তাওবার দরজা বন্ধ

সুদ এমন একটি গুনাহ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সুদখোর সম্পূর্ণরূপে সুদ ত্যাগ না করবে এবং পাওনা সুদ ছেড়ে না দেবে, ততক্ষণ তার তাওবা কবুল হবে না।

৭। কোনো ধরনের ইবাদাত কবুল না হওয়া

ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য উপার্জন হালাল হওয়া জরুরি। সুদখোরের উপার্জন হালাল নয় তাই তার ইবাদাতও কবুল হয় না।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
"আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না।"

আর আল্লাহ তাআলা তার প্রেরিত রাসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

অর্থ: তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোনো আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিজিক হিসেবে দিয়েছি তা খাও।

অত:পর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূরদূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধূলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অত:পর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, “হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু’আ তিনি কী করে কবুল করতে পারেন?

৮। সুদখোরদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম
সুদখোর পরকালীন জীবনে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। কেননা সুদ হলো হারাম মাল। আর হারাম মাল খেলে তার বাস স্থান জাহান্নামে।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ السُّحْتِ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

যে দেহের গোশত হারামের উপার্জনে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম ধন-সম্পদ হতে গঠিত ও লালিত পালিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযোগী।

(মিশকাত, ২৭৭২)

৯। চূড়ান্ত অপমান ও লাঞ্ছনা

কিয়ামতের দিন সুদখোরকে এমন অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে যে, সে যদি জানত দুনিয়ায় কোনো দিন সুদের সংস্পর্শে আসত না।

৪.৩.২

সুদের পার্থিব ক্ষতি:

সুদের প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকেও ধ্বংসাত্মক। এটি ধনী-গরিবের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি করে, সমাজে শোষণমূলক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিকে দুর্বল করে ফেলে। নিচে সুদের কারণে যে পার্থিব ক্ষতি সাধিত হয় তা আলোচনা করা হলো—

১. সুদের কারণে দুনিয়াতেও ধ্বংস আসে

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

অর্থ : যখন কোনো সমাজে সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেদের জন্য আল্লাহর শাস্তিকে অনুমোদন করে নেয়।

(মুসনাদে আহমাদ: ২৪৪৯২)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

অর্থ : যখন কোনো জনপদে যদি ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সেই এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের উপর আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে নেয়।

(হাকিম: ২২৬১, তাবারানি: ৪৬০, সহিহুল জামে: ৬৭৯)

২. সুদ দুনিয়াবী জীবনে নিঃস্ব করে
মহান আল্লাহ বলেন-

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

অর্থ : আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না।

(সুরা আল বাকারহ: ২৭৬)

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنهথেকে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلمবলেন-

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

অর্থ : যে ব্যক্তি সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হবেই।

(সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৭৯)

৪.৪ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি

৪.৪.১ নৈতিক ক্ষতি (Ethical Harms)
লোভ ও কৃপণতা সৃষ্টি:
সুদ মানুষকে লোভী, স্বার্থপর এবং কৃপণ করে তোলে। বিনাশ্রমে, কোনো ঝুঁকি না নিয়ে বা শ্রম না দিয়েই অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধকে নষ্ট করে। সুদখোর ব্যক্তি সংকীর্ণমনা ও অর্থপূজারি হয়ে ওঠে, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

সহানুভূতি ও সহমর্মিতার অভাব:
সুদ সমাজে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মতো মহৎ গুণাবলীর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।
স্বার্থান্ধতা এবং ব্যক্তিগত লাভের চিন্তা মানুষকে অন্যের দুঃখে পাশে দাঁড়াতে নিরুৎসাহিত করে।

শ্রমবিমুখতা ও অলসতা বৃদ্ধি:
সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় কোনো পরিশ্রম ও ঝুঁকি ছাড়াই নির্দিষ্ট হারে আয় পাওয়া যায়। এটি কর্মঠ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকেও শ্রমবিমুখ ও অলস করে তুলতে পারে।
উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের বদলে অর্থ সঞ্চয়েই আগ্রহ জন্মায়, ফলে সমাজের মেধা ও শ্রমের সঠিক ব্যবহার হয় না।

জুলুম ও শোষণ:
সুদকে এক প্রকার নিদারুণ জুলুম (অবিচার) ও শোষণ হিসেবে দেখা হয়। ঋণগ্রহীতার লাভ-ক্ষতি যাই হোক, তাকে সুদ দিতেই হয়। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের উপার্জনের একটি বড় অংশ কেবল সুদ পরিশোধেই ব্যয় করতে বাধ্য হয়, যা তাদেরকে আরও দরিদ্র করে তোলে।

ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি:
সুদখোর পুঁজিপতিরা দরিদ্রের সম্পদ কুক্ষিগত করায় সমাজে শ্রেণিগত বৈষম্য, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এটি সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করে।

৪.৪.২
আধ্যাত্মিক ক্ষতি (Spiritual Harms)
ঈমান ও বিবেকের অবক্ষয়:
সুদের কারবার ব্যক্তির ঈমান (বিশ্বাস) ও বিবেককে দুর্বল করে দেয়। বিনাশ্রমে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার প্রবণতা ধীরে ধীরে তাকে আধ্যাত্মিক পতন বা অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা (ইসলামী দৃষ্টিকোণ):
ইসলামী শিক্ষানুসারে, যারা জেনে-বুঝে সুদ পরিত্যাগ করে না, তারা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এটি একটি অত্যন্ত ভয়াবহ ও জঘন্য পাপ।
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন শয়তানের স্পর্শে মত্ত ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে (সূরা বাকারা: ২৭৫)।

পাপের ভয়াবহতা:

সুদের পাপকে অনেক ধর্মেই গুরুতর বলে মনে করা হয়। হাদিসে সুদের পাপের তিয়াত্তরটি স্তরের কথা বলা হয়েছে, যার সর্বনিম্নটি একজন ব্যক্তি কর্তৃক তার মাকে যিনা করার সমতূল্য।

জান্নাত লাভের ব্যর্থতা ও শাস্তি:
ইসলামে সুদি লেনদেনকারীদের জন্য জাহান্নামের কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে বলে বলা হয়েছে। সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদকে হারাম (নিষিদ্ধ) গণ্য করা হয়।

সামাজিক বিপর্যয় ও ঐক্যের অভাব:
যে সমাজে সুদের ব্যাপক প্রচলন ঘটে, সেখানে আল্লাহর আজাব ও বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে ইসলামে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। সুদ সামাজিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে, যা আধ্যাত্মিক দিক থেকেও একটি নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে।

অধ্যায় - ৫: ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Islamic Economic System)

৫.১ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা:

সহজ ও ব্যাপক অর্থে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো বা জীবনব্যবস্থা, যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর (শরিয়া) নির্দেশনার আলোকে মানুষের সম্পদ উপার্জন, ব্যয়, বন্টন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

একে আরও বিস্তারিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে:
"ইসলামী অর্থনীতি হলো এমন একটি সমাজবিজ্ঞান যা মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে এবং ইসলামি শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে থেকে ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সমাধান প্রদান করে।"

ইসলামী অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞার প্রধান ৩টি দিক নিচে তুলে ধরা হলো:
১. আল্লহর নির্দেশনাই মূল ভিত্তি
অন্যান্য অর্থব্যবস্থা (যেমন পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র) মানুষের তৈরি মতবাদের ওপর ভিত্তি করে চলে। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো আল্লাহর দেওয়া বিধান। এখানে বিশ্বাস করা হয়, সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং মানুষ কেবল তার প্রতিনিধি হিসেবে সেই সম্পদ ব্যবহারের অধিকারী।

২. হালাল ও হারামের সীমারেখা
এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে, তবে তা অবাধ নয়।
যা কিছু সমাজের জন্য ক্ষতিকর (যেমন—সুদ, জুয়া, মজুদদারি, প্রতারণা) তা হারাম বা নিষিদ্ধ।
যা কিছু কল্যাণকর এবং নৈতিক, তা হালাল বা বৈধ।

৩. ইহকাল ও পরকালের সমন্বয়
ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কেবল জাগতিক মুনাফা বা সম্পদ বৃদ্ধিই লক্ষ্য নয়। এর মূল লক্ষ্য হলো 'ফালাহ' বা কল্যাণ। অর্থাৎ, এমনভাবে অর্থনৈতিক কাজ করা যাতে দুনিয়াতে সচ্ছলতা আসে এবং পরকালেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুক্তি পাওয়া যায়।
এক কথায়:

যে অর্থব্যবস্থা সুদমুক্ত, শরিয়াভিত্তিক এবং নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করে, তাকেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

৫.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য

ইসলামী অর্থব্যবস্থা এবং প্রচলিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (যা মূলত পুঁজিবাদী বা মিশ্র অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল) মধ্যে মৌলিক এবং আদর্শিক পার্থক্য অনেক গভীর। বিশ্ব অর্থনীতি যেখানে বস্তুবাদী এবং মুনাফাকেন্দ্রিক, ইসলামী অর্থনীতি সেখানে নৈতিকতা এবং মানবকল্যাণমুখী।
নিচে এই দুই ব্যবস্থার মধ্যকার প্রধান পার্থক্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. মূল দর্শন ও মালিকানা (Philosophy & Ownership)

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা: এখানে বিশ্বাস করা হয় যে, সম্পদের মালিক মানুষ নিজেই। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করতে পারে। মূল লক্ষ্য হলো 'সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন' (Profit Maximization)।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা: এখানে পরম বিশ্বাস হলো—আসমান ও জমিনের সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। মানুষ কেবল আমানতদার বা প্রতিনিধি। মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধ (হালাল-হারাম) মেনে সম্পদ ব্যবহার করতে হয়।

২. সুদ বা রিবা (Interest vs. Riba)

এটি দুই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় পার্থক্য।

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা: সুদ বা 'ইন্টারেস্ট' হলো প্রচলিত অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এখানে টাকার বিনিময়ে টাকা আয় করা বৈধ। ব্যাংক ঋণ দিয়ে নিশ্চিত মুনাফা (সুদ) নেয়, ব্যবসার ফলাফল যাই হোক না কেন।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা: সুদ সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। টাকা নিজে কোনো সন্তান জন্ম দিতে পারে না। এখানে মুনাফা অর্জনের জন্য টাকার সাথে শ্রম বা পণ্যের সংযোগ থাকতে হবে এবং ঝুঁকি নিতে হবে।

৩. ঝুঁকি বন্টন (Risk Sharing)

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা: এখানে ঝুঁকি একপাক্ষিক। ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে টাকা দেয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর আসল ও সুদ ফেরত চায়। ব্যবসায় লোকসান হলে তার দায় ব্যাংক নেয় না, পুরো চাপ ঋণগ্রহীতার ওপর পড়ে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা: এটি 'লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব' (Profit and Loss Sharing) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাংক যখন বিনিয়োগ করে, তখন সে ব্যবসায়িক অংশীদার হয়। লাভ হলে উভয়ে ভাগ করে নেয়, আর লোকসান হলে ব্যাংকও তার মূলধনের অনুপাতে লোকসান বহন করে। এটি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

৪. টাকার ভূমিকা (Role of Money)

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা: এখানে টাকাকে (Money) একটি 'পণ্য' (Commodity) হিসেবে দেখা হয়। টাকা কেনা-বেচা করা যায় এবং ভাড়ায় (ঋণ) খাটিয়ে লাভ করা যায়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা: এখানে টাকা বা মুদ্রা হলো কেবল 'বিনিময়ের মাধ্যম' (Medium of Exchange)। টাকার নিজস্ব কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। টাকাকে পণ্যে রূপান্তর না করা পর্যন্ত তা দিয়ে মুনাফা দাবি করা যায় না।

৫. নৈতিকতা ও হালাল-হারাম (Ethics vs. Materialism)

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা: এখানে নৈতিকতা ঐচ্ছিক। যদি কোনো ব্যবসা দেশের আইনে বৈধ হয় (যেমন—মদ উৎপাদন, জুয়া বা ক্যাসিনো, অশ্লীল বিনোদন), তবে তা থেকে আয় করতে কোনো বাধা নেই।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা: এখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে কিন্তু তা শরিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিকভাবে ক্ষতিকর বা ইসলামে নিষিদ্ধ (যেমন—মদ, জুয়া, শূকর, অস্ত্র) কোনো খাতে বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ হারাম, তা যত লাভজনকই হোক না কেন।

৬. সম্পদ বন্টন ও যাকাত (Wealth Distribution)

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা: এখানে ধনীদের ওপর কর (Tax) আরোপ করা হয়, কিন্তু প্রায়শই কর ফাঁকি দেওয়া হয় বা সম্পদ ধনীদের হাতে কুক্ষিগত থাকে (Capital Accumulation)।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা: এখানে যাকাত একটি বাধ্যতামূলক ইবাদত। সমাজের ধনীদের অলস পড়ে থাকা সম্পদের ২.৫% গরিবদের মাঝে বন্টন করা ফরজ। এটি সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

৭. কৃচ্ছ্রসাধন বনাম ভোগবাদ (Moderation vs. Consumerism)

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা: প্রচলিত অর্থনীতি মানুষকে বেশি বেশি ভোগ করতে উৎসাহিত করে (Consumerism)। বিজ্ঞাপন ও ঋণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করা হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা: ইসলাম অপচয় (ইসরাফ) এবং কৃপণতা উভয়কেই নিষেধ করেছে। এখানে মধ্যপন্থা অবলম্বন বা মিতব্যয়িতাকে উৎসাহিত করা হয়।

সারসংক্ষেপ:
বিশ্ব অর্থব্যবস্থা মূলত "ঋণভিত্তিক" (Debt-based), যা ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও ঋণী করে। অন্যদিকে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা "সম্পদভিত্তিক" (Asset-backed) এবং অংশীদারিত্বমূলক, যা সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

৫.৩ ইসলামে ব্যবসা - বাণিজ্যের গুরুত্ব

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি হালাল উপার্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার প্রধান উপায়।

এখানে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. হালাল উপার্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

কুরআনের ঘোষণা: আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।
“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (সূরা বাকারা: ২৭৫)

উত্তম জীবিকা: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মানুষের দুই হাতের কাজ ও হালাল ব্যবসায় উপার্জন উত্তম।"

২. নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের পেশা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়ত লাভের আগে নিজেও ব্যবসা করতেন এবং সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য 'আল-আমিন' উপাধি লাভ করেছিলেন।

সাহাবীগণের অবলম্বন: হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) সহ অনেক বড় সাহাবীই ছিলেন সফল ব্যবসায়ী।

৩. পরকালে মর্যাদা ও পুরস্কার

সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে হাশর:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ معَ النبِيِّينَ والصِدِّيقِينَ والشهداءِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِي.ّ

আবূ সা’ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের দলে থাকবেন। (২৭৯৬ নং মিশকাত)

আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ: আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪. সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি

সম্পদ আবর্তন: ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সচল রাখে এবং সম্পদের আবর্তন ঘটায়, যা সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

দাওয়াতের মাধ্যম: ইসলামের ইতিহাসে অনেক অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায়, সৎ ও আদর্শবান ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

কল্যাণমূলক কাজ: ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দ্বারা যাকাত, সাদাকাহ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব হয়।

৫. ইবাদতের সাথে সমন্বয়
ভারসাম্য রক্ষা: ইসলামে শুধু মসজিদে বসে থাকাকে উৎসাহিত করা হয়নি, বরং ইবাদত ও ব্যবসার মধ্যে সমন্বয় করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاِ ذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَا نْتَشِرُوْا فِى الْاَ رْضِ وَا بْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَا ذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক- যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।"
(আল জুমুআহ: আয়াত ১০)

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই গুরুত্বের সাথে অবশ্যই সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা এবং সকল প্রকার ধোঁকাবাজি ও সুদ বর্জনের মতো ইসলামী মূলনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

৫.৪ সুদ (রিবা) ও ব্যবসার মাঝে পার্থক্য

৫.৪.১সুদ (রিবা)

১। সংজ্ঞা : নির্ধারিত অতিরিক্ত মূল্য যা ঋণের শর্ত হিসেবে আদায় করা হয়।

২. ঝুঁকি (Risk) ও অনিশ্চয়তা

কোনো ঝুঁকি নেই। ঋণদাতা তার মূলধন এবং পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ (সুদ) নিশ্চিতভাবে ফেরত পাবেন, ঋণগ্রহীতার লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন।

৩. প্রতিদান বা বিনিময়

কোনো পণ্যের বিনিময় নেই। অতিরিক্ত অর্থ কেবল অর্থ ব্যবহারের সময় বা অবকাশের জন্য নেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতার কাছে ঋণের ব্যবহারের কোনো উপযোগ মূল্য (Counter-value) ঋণদাতা প্রদান করেন না।

৪. লাভের নিশ্চয়তা

নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত লাভ। সুদের হার ও পরিমাণ আগে থেকেই নির্দিষ্ট থাকে, যা অবশ্যই দিতে হবে।

৫. লেনদেনের সময়কাল

সময় বাড়ার সাথে সাথে বাড়ে। আসল অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের অনুপাতে সুদের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

৬. সামাজিক প্রভাব

শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। সম্পদ কেবল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমা হয় এবং দরিদ্র ঋণী আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭. ইসলামী হুকুম

কঠোরভাবে হারাম (নিষিদ্ধ)। কুরআনে সুদখোরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৮. সম্পদের সৃষ্টি

বাস্তব কোনো সম্পদ বা সেবা সৃষ্টি হয় না। এটি অর্থকে স্বয়ংসম্পূর্ণ পণ্য হিসেবে গণ্য করে।

৯. অর্থনৈতিক প্রভাব

ঋণের বোঝা → দারিদ্র্য → নিঃস্বতা → সামাজিক অস্থিরতা

সরকার বা দেশ → Debt Trap
উৎপাদন কমে যায়
সম্পদ কিছু ধনী গোষ্ঠীর হাতে জমা হয়।

১০. মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য
মানুষকে উদ্বিগ্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ঋণের বোঝায় চাপা ফেলে।
পরিবার, সম্পর্কেও প্রভাব পড়ে।

৫.৪.২ ব্যবসা:
১। সংজ্ঞা : মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা। এখানে মুনাফা-ক্ষতি উভয়ই সম্ভব। পণ্য বা সেবা বিনিময় থেকে উদ্ভূত। এক পক্ষের কাছ থেকে পণ্য বা সেবা গ্রহণ করে অপর পক্ষ তার মূল্য পরিশোধ করে।

২. ঝুঁকি (Risk) ও অনিশ্চয়তা
ব্যাপক ঝুঁকি বিদ্যমান। লাভ ও লোকসান উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। বিনিয়োগকারীকে শ্রম, বুদ্ধি ও সময় দিতে হয় এবং বাজারের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়।

৩. প্রতিদান বা বিনিময়
পণ্যের বা সেবার স্পষ্ট বিনিময় বিদ্যমান। বিক্রেতা পণ্য/সেবা দেয় এবং ক্রেতা তার মূল্য পরিশোধ করে। উভয় পক্ষই লাভবান হয় বা হতে পারে।

৪. লাভের নিশ্চয়তা
অনিশ্চিত লাভ। লাভ কম-বেশি হতে পারে, এমনকি লোকসানও হতে পারে। এটি নির্ভর করে বাজার, চাহিদা, পরিশ্রম ও দক্ষতার ওপর।

৫.লেনদেনের সময়কাল
এককালীন লেনদেন। পণ্য ও মূল্য বিনিময়ের সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। বিক্রেতা একবারই মুনাফা গ্রহণ করেন।

৬. সামাজিক প্রভাব

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধন করে। সম্পদ সমাজে আবর্তিত হয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

৭.ইসলামী হুকুম

হালাল (বৈধ) ও উৎসাহিত। এটি উত্তম জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম।

৮. সম্পদের সৃষ্টি

বাস্তব সম্পদ ও সেবার সৃষ্টি হয়। উৎপাদন, বণ্টন, বিপণন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন হয়।

৯. অর্থনৈতিক প্রভাব

উৎপাদন বাড়ায়
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
GDP বৃদ্ধি করে
অর্থ সমাজে ঘোরে → "সুস্থ অর্থচক্র" (Healthy economic cycle)

১০. মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য

উদ্যম, শ্রম, দক্ষতা, উদ্যোক্তা মানসিকতা বাড়ায়।
উন্নতি ও সাফল্যের অনুভূতি দেয়।

ইসলামে কেন ব্যবসা হালাল, সুদ হারাম?

- ✔ সুদ → শোষণ
- ✔ ব্যবসা → সহযোগিতা
- ✔ সুদ → অন্যায়ভাবে বৃদ্ধিকারী
- ✔ ব্যবসা → মূল্য সংযোজনকারী
- ✔ সুদ → ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধ্বংস
- ✔ ব্যবসা → উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি

এক কথায়,

সুদ হলো ঝুঁকিবিহীন অন্যায় লাভ, আর ব্যবসা হলো মূল্য-সংযোজন সহ ঝুঁকিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বিনিময়।

৫.৫ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান:

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণরূপে শরিয়া বা ইসলামি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এটি সুদমুক্ত (রিবা-মুক্ত), লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং এমন সব কার্যক্রমে জড়িত থাকে যা ইসলামের নৈতিক এবং সামাজিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা:

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো এমন একটি আর্থিক সংগঠন যা শরিয়া বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনা করে এবং সুদ, জুয়া (মাইসির), বা হারাম পণ্যের ব্যবসা থেকে বিরত থাকে।

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি

সুদমুক্ত লেনদেন: ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ, তাই সব ধরনের আর্থিক লেনদেন সুদমুক্ত হতে হবে।

লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব: ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতির ভিত্তিতে লেনদেন পরিচালিত হয়।

জুয়া নিষিদ্ধ: অর্থনৈতিক কার্যক্রমে জুয়া বা মাইসির সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হারাম পণ্যের বিনিয়োগ নিষিদ্ধ: অ্যালকোহল, অস্ত্র, সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা হারাম পণ্যের ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যাবে না।

নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা: ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানুষের কল্যাণ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে কাজ করে।

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ শরিয়ার আলোকে পরিচালিত হতো।

১৯৬৩ সালে মিসরের মিড গামর ব্যাংক প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৭০-এর দশকে আধুনিক ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।
১৯৭৫ সালে দুবাই ইসলামি ব্যাংক এবং ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) প্রতিষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা শুরু হয় ১৯৮৩ সালে, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (IBBL) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা

শরিয়া বোর্ডের নির্দেশনা: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শরিয়া স্কলারদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড থাকে।
মুদারাবা: মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা।

মুশারাকা: লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ।

মুরাবাহা: পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক চুক্তি।

ইজারা: লিজিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ ব্যবহার।

সাদাকা ও যাকাত ব্যবস্থাপনা: সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য।

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।
সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম।
ন্যায়সংগত মুনাফা বণ্টন।
দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন।
হারাম কার্যক্রম থেকে দূরে থাকা।
ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুবিধা
সামাজিক উন্নয়ন: দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে।
বিনিয়োগের নিরাপত্তা: শরিয়া নীতির কারণে ঝুঁকি হ্রাস পায়।
সাম্যতা: লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে ন্যায্য বণ্টন।
দারিদ্র্য বিমোচন: মাইক্রোফাইন্যান্সের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা।

অধ্যায় - ৬: “ইসলামী অর্থনীতি: সুদের (রিবা) সমস্যা মোকাবিলার একটি সমাধান(Islamic Economics: A Solution to the Problem of Interest (Riba)

৬.১ মুশারাকা

বা অংশীদারী কারবার

“মুশারাকা” মূলত আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ শরীক বা অংশীদার হওয়া। কারবার ও ব্যবসাবানিজ্যের পরিভাষায় মুশারাকা বলতে এমন এক যৌথ কারবারকে বুঝায়, যে কারবারে সকল অংশীদার যৌথ কারবারের লাভ লোকসানে শরীক থাকে। মুশারাকা বা অংশীদারি কারবার সুদভিত্তিক অর্থায়নের একটি আদর্শিক বিকল্প ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ের সাথে অংশীদারগণ জড়িত থাকে। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় সুদই একমাত্র মাধ্যম যাকে সর্বপ্রকারের অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইসলামে যেহেতু সুদ হারাম, সেহেতু একে কোন ধরনের অর্থায়ন (Financing) এর জন্য ব্যবহার করা যায় না। এজন্য ইসলামী মূলনীতিভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থায় ‘মুশারাকা’ সময়ের দাবী পূরণে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সুদি ব্যবস্থাপনায় ফাইন্যান্সার কর্তৃক প্রদেয় ঋণের উপর অতিরিক্ত পরিশোধযোগ্য টাকার পরিমাণ পূর্বেই ধার্য করা হয়। ঋণগ্রহীতার লাভ হোক বা লোকসান হোক, এর প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অপরদিকে মুশারাকায় পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ পূর্বে ধার্য করা হয় না। বরং এতে মুনাফার ভিত্তি হল অংশীদারি কারবারে অর্জিত প্রকৃত মুনাফার উপর। সুদি কারবারে বিনিয়োগকারী (ফাইন্যান্সার) কোন অবস্থাতেই লোকসানের দায়িত্ব বহন করে না। কিন্তু মুশারাকায় ফাইন্যান্সারের লোকসানও হতে পারে, যদি এ যৌথ ব্যবসায় লাভ না হয়।

ইসলাম সুদকে একটি ইনসাফবিবর্জিত পন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কেননা, এর ফলাফল ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের মাঝে বৈষম্য ও বে-ইনসাফীর আকারে প্রকাশ পায়। যদি ঋণগ্রহীতার ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে ঋণদাতার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অর্থের দাবী করা বে-ইনসাফী। অন্যদিকে যদি ঋণগ্রহীতা ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণ লাভবান হয়, তাহলে লাভের

সামান্যতম অংশ ঋণদাতাকে দিয়ে অবশিষ্ট সমুদয় লভ্যাংশ ঋণগ্রহীতার কুক্ষিগত করাও ইনসাফসম্মত নয়।

মুশারাকা' শব্দটি আরবি শব্দ 'শিরকাহ' থেকে এসেছে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো "অংশীদারিত্ব" বা কোনো কিছুতে একে অপরের সাথে শরিক হওয়া।

পারিভাষিক অর্থে: মুশারাকা হলো এমন একটি ব্যবসায়িক চুক্তি যেখানে দুই বা ততোধিক পক্ষ যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে একটি ব্যবসা বা প্রকল্প পরিচালনা করতে সম্মত হয়। এই ব্যবসায় অর্জিত লাভ পূর্বনির্ধারিত একটি অনুপাতে তাদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং যদি ক্ষতি হয়, তবে তা তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের অনুপাতে বহন করতে হয়।

সহজ কথায়, এটি একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার (Joint Venture) যেখানে ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়েই মূলধন বিনিয়োগ করে এবং ব্যবসার ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগ করে নেয়।

২. মুশারাকার মূল নীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

মুশারাকা চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত ও নীতি মেনে চলতে হয়:

- **যৌথ মূলধন (Joint Capital):** চুক্তির সকল পক্ষকে মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে। এই মূলধন নগদ অর্থ বা সমমূল্যের সম্পদ হতে পারে। তবে মূলধনের পরিমাণ সমান হওয়া জরুরি নয়।
- **লাভের বণ্টন (Distribution of Profit):** ব্যবসার লাভ কীভাবে বণ্টিত হবে, তা চুক্তির শুরুতেই নির্ধারণ করতে হবে। এটি মূলধনের অনুপাতে হতে পারে, অথবা আপসী সম্মতিতে ভিন্ন কোনো অনুপাতেও হতে পারে। (যেমন: একজন ৬০% মূলধন দিয়েও ৫০% লাভের চুক্তিতে আসতে পারে, যদি সে ব্যবসায় বেশি শ্রম দেয়)।
- **ক্ষতির বণ্টন (Sharing of Loss):** এটি মুশারাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। **ক্ষতি অবশ্যই প্রতিটি অংশীদারের বিনিয়োগকৃত মূলধনের অনুপাতে বহন করতে হবে।** এখানে পূর্বনির্ধারিত অন্য কোনো অনুপাত কার্যকর হবে না। এটিই সুদভিত্তিক ঋণের সাথে এর প্রধান পার্থক্য।
- **ব্যবস্থাপনা (Management):** ব্যবসার ব্যবস্থাপনায় সকল অংশীদার অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখে। তবে তারা চাইলে আপসী সম্মতিতে তাদের মধ্য থেকে একজনকে বা বাইরের কোনো তৃতীয় পক্ষকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিতে পারে। যদি কোনো অংশীদার ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে, তবে সে লাভের অতিরিক্ত অংশ দাবি করতে পারে, কিন্তু আলাদাভাবে বেতন নিতে পারবে না (কিছু মতভেদ বাদে)।

৩. মুশারাকার প্রকারভেদ

ইসলামী অর্থায়নে মুশারাকাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর কয়েকটি রূপ রয়েছে:

ক. শিরকাতুল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্ব):

যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো সম্পত্তির যৌথ মালিক হন, কিন্তু কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি করেন না। যেমন: উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি।

খ. শিরকাতুল আকদ (চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারিত্ব):

এটিই হলো বাণিজ্যিক মুশারাকা। যখন পক্ষগুলো স্বেচ্ছায় মূলধন বিনিয়োগ করে ব্যবসা করার চুক্তি করে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলো এটিই ব্যবহার করে।

ব্যবহারিক দিক থেকে ব্যাংকিংয়ে দুই ধরনের মুশারাকা বেশি প্রচলিত:

1. **স্থায়ী মুশারাকা (Permanent Musharakah):** এক্ষেত্রে ব্যাংক এবং গ্রাহক একটি প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদে মূলধন বিনিয়োগ করে। প্রকল্পটি যতদিন চলবে, ততদিন উভয় পক্ষ শেয়ার অনুযায়ী লাভ-ক্ষতি ভোগ করবে। এটি সাধারণত বড় কোম্পানি গঠন বা দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের ক্ষেত্রে হয়। এর কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থাকে না।
2. **ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা (Diminishing Musharakah / Musharakah Mutanaqisa):** এটি আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় পণ্য, বিশেষ করে বাড়ি বা গাড়ি কেনার অর্থায়নের ক্ষেত্রে।
    - **পদ্ধতি:** এতে ব্যাংক এবং গ্রাহক যৌথভাবে একটি সম্পত্তি কেনে (যেমন: একটি বাড়ি)। ধরুন, গ্রাহক ২০% এবং ব্যাংক ৮০% টাকা দিল।
    - বাড়িটির মালিকানা দুজনের। গ্রাহক বাড়িটি ব্যবহার করে, তাই সে ব্যাংকের ৮০% শেয়ার ব্যবহারের জন্য ব্যাংককে 'ভাড়া' প্রদান করে।
    - একই সাথে, গ্রাহক ভাড়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে ধীরে ধীরে ব্যাংকের শেয়ার কিনতে থাকে।
    - এভাবে একসময় ব্যাংকের শেয়ার শূন্য হয়ে যায় এবং গ্রাহক সম্পত্তির একক মালিক হয়ে যায়।

৪. মুশারাকা কীভাবে কাজ করে? (একটি উদাহরণ)

ধরি, জনাব রহিম একটি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করতে চান। তার মোট ১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তার কাছে আছে ৪ লক্ষ টাকা। তিনি ইসলামী ব্যাংকের কাছে গেলেন।

1. **চুক্তি:** ব্যাংক ও রহিম মুশারাকা চুক্তিতে একমত হলেন। ব্যাংক দিল ৬ লক্ষ টাকা (৬০%) এবং রহিম দিলেন ৪ লক্ষ টাকা (৪০%)। মোট মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

2. **লাভের শর্ত:** তারা একমত হলেন যে, যেহেতু রহিম ব্যবসা পরিচালনা করবেন (শ্রম দেবেন), তাই লাভ হলে রহিম পাবেন ৫০% এবং ব্যাংক পাবে ৫০% (যদিও মূলধন অনুপাত ৪০:৬০)।
3. **ব্যবসা পরিচালনা:** রহিম ব্যবসা শুরু করলেন এবং এক বছর পর ২ লক্ষ টাকা লাভ হলো।
4. **লাভ বণ্টন:** চুক্তি অনুযায়ী রহিম পাবেন ১ লক্ষ টাকা (৫০%) এবং ব্যাংক পাবে ১ লক্ষ টাকা (৫০%)।
5. **ক্ষতির ক্ষেত্রে:** যদি ব্যবসায় ১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতো, তবে তা অবশ্যই মূলধন অনুপাতে ভাগ হতো। অর্থাৎ, রহিম বহন করতেন ৪০,০০০ টাকা (৪০%) এবং ব্যাংক বহন করত ৬০,০০০ টাকা (৬০%)।

৫. মুশারাকার সুবিধা

- **শরীয়াহ সম্মত:** এটি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত এবং ইসলামী শরীয়াহর নীতি মেনে চলে।
- **ঝুঁকি বণ্টন:** ব্যবসায় ক্ষতি হলে তা একা গ্রাহককে বহন করতে হয় না, ব্যাংকও তার ভাগ নেয়। এটি উদ্যোক্তাদের জন্য বড় স্বস্তি।
- **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** এটি প্রকৃত ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে, যা দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
- **ন্যায়বিচার:** লাভ হলে সবাই পায়, ক্ষতি হলে সবাই বহন করে—এটি একটি ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি।

৬. মুশারাকার চ্যালেঞ্জ বা অসুবিধা

- **বিশ্বস্ততার ঝুঁকি (Moral Hazard):** গ্রাহক যদি অসৎ হয় এবং প্রকৃত লাভ গোপন করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি দেখায়, তবে ব্যাংকের জন্য তা বড় ঝুঁকি।
- **হিসাবরক্ষণের জটিলতা:** লাভ-ক্ষতি সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং উন্নত হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন, যা অনেক সময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের থাকে না।
- **তদারকি ব্যয়:** ব্যাংককে ব্যবসার ওপর নজরদারি রাখতে হয়, যা ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় বাড়িয়ে দেয়।

উপসংহার

মুশারাকা হলো ইসলামী অর্থনীতির একটি আদর্শ রূপ, যেখানে অর্থায়ন মানে কেবল ঋণ দেওয়া নয়, বরং ব্যবসায়িক অংশীদার হওয়া। যদিও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে সততা ও স্বচ্ছতার অভাবে, তবুও এটি একটি শোষণমুক্ত এবং ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

৬.২ মুদারাবা

মুদারাবা (Mudaraba) হলো ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশীদারিত্বমূলক (Partnership) ব্যবসায়িক পদ্ধতি। সহজ কথায়, এটি এমন একটি চুক্তি যেখানে এক পক্ষ মূলধন বা টাকা সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ মেধা ও শ্রম দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে।

নিচে মুদারাবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. মুদারাবার মূল সংজ্ঞা

আরবি 'মুদারাবা' শব্দটি এসেছে 'দারব' থেকে, যার অর্থ ভ্রমণ করা বা চেষ্টা করা। পারিভাষিক অর্থে, এটি এমন একটি অংশীদারিত্ব যেখানে:

এক পক্ষ মূলধন (Capital) বিনিয়োগ করে।

অন্য পক্ষ তার দক্ষতা ও শ্রম (Expertise and Labor) দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে।

উভয়ে সম্মত একটি অনুপাতে অর্জিত মুনাফা (Profit) ভাগ করে নেয়।

২. মুদারাবার পক্ষসমূহ

এই চুক্তিতে সাধারণত দুটি প্রধান পক্ষ থাকে:

রাব্বুল মাল (Rabb-ul-Maal): ইনি হলেন বিনিয়োগকারী বা মূলধন দাতা। তিনি ব্যবসার জন্য টাকা দেন কিন্তু সরাসরি ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশ নেন না।

মুদারিব (Mudarib): ইনি হলেন উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক। তিনি কোনো টাকা বিনিয়োগ করেন না, বরং তার মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে ব্যবসাটি পরিচালনা করেন।

৩. লাভ ও লোকসান বন্টন নীতি (Profit & Loss Sharing)

মুদারাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লাভ ও লোকসান বন্টনের নিয়ম।

মুনাফা (Profit): ব্যবসা থেকে যদি লাভ হয়, তবে তা পূর্বনির্ধারিত একটি অনুপাতে (যেমন: ৫০:৫০, ৬০:৪০ বা ৭০:৩০) উভয় পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়।

সতর্কতা: লাভের পরিমাণ কখনোই নির্দিষ্ট টাকার অংকে (যেমন: ৫০০০ টাকা) নির্ধারণ করা যাবে না, এটি অবশ্যই শতাংশে (Percentage) হতে হবে।

লোকসান (Loss): যদি ব্যবসায় লোকসান হয় এবং তা মুদারিবের অবহেলা বা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে না হয়, তবে:
আর্থিক লোকসান: সম্পূর্ণ আর্থিক লোকসান রাব্বুল মাল (বিনিয়োগকারী) বহন করবেন।

শ্রমের লোকসান: মুদারিব (উদ্যোক্তা) তার শ্রম ও সময়ের জন্য কোনো পারিশ্রমিক পাবেন না। এটিই তার লোকসান।

৪. মুদারাবার প্রকারভেদ
কাজের স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে মুদারাবা দুই প্রকার হতে পারে:
আল-মুদারাবা আল-মুতলাকাহ (Unrestricted): এখানে রাব্বুল মাল মুদারিবকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। মুদারিব যেকোনো হালাল ব্যবসায়, যেকোনো স্থানে এবং যেকোনো সময়ে বিনিয়োগ করতে পারেন।

আল-মুদারাবা আল-মুকাইয়াদাহ (Restricted): এখানে রাব্বুল মাল কিছু শর্ত জুড়ে দেন। যেমন: নির্দিষ্ট কোনো পণ্য, নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসা করতে হবে। মুদারিব এর বাইরে যেতে পারেন না।

৫. প্রচলিত ব্যাংক ঋণ (Interest-based Loan)
রিটার্ন: নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয় (লাভ বা লস যাই হোক)।

ঝুঁকি: সম্পূর্ণ ঝুঁকি ঋণগ্রহীতার।

সম্পর্ক: ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা (Creditor & Debtor)।

মুদারাবা:
রিটার্ন : লাভের অংশ দেওয়া হয়, লোকসান হলে মূলধন কমে যায়।

ঝুঁকি: আর্থিক ঝুঁকি বিনিয়োগকারীর (Capital Provider)।

সম্পর্ক : অংশীদার (Partners)।

৬. মুদারাবা বাতিল হওয়ার কারণ

কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এই চুক্তি বাতিল হতে পারে:

কোনো এক পক্ষের মৃত্যু হলে বা পাগল হয়ে গেলে।

ব্যবসার মূলধন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে।

মেয়াদ শেষ হলে (যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি হয়)।

উভয় পক্ষের সম্মতিতে বা নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে।

মুদারাবা মূলত সততা এবং আস্থার ওপর ভিত্তি করে গঠিত একটি ব্যবস্থা, যা সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করে।

৬.৩ ইজারা

ইজারা (Ijarah) হলো ইসলামি ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সহজ বাংলায় এর অর্থ হলো 'ভাড়া দেওয়া' বা 'বিনিময়ে সেবা প্রদান'।

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের (Bai) পরেই ইজারার অবস্থান। নিচে ইসলামের আলোকে ইজারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:
১. ইজারার সংজ্ঞা
আভিধানিক অর্থে ইজারা মানে হলো কোনো কিছুর বিনিময়ে কোনো কাজ করা বা শ্রম দেওয়া।

পারিভাষিক অর্থে, কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর মালিকানা হস্তান্তর না করে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে সেই বস্তুর উপকার বা সেবা (Usufruct) ভোগ করার অধিকার বিক্রি করাকে ইজারা বলে।

২. ইজারার প্রকারভেদ

ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী ইজারা প্রধানত দুই প্রকার:
ক. ইজারাতুল আশখাস (শ্রম বা সেবার ইজারা)
এটি মূলত চাকরি বা নিয়োগ সংক্রান্ত। যখন কোনো ব্যক্তিকে তার শ্রম বা দক্ষতার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

উদাহরণ: শ্রমিক নিয়োগ, ডাক্তার, উকিল বা শিক্ষকের সেবা গ্রহণ।

হাদিস: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ)

খ. ইজারাতুল আ'ইয়ান (সম্পদের ইজারা)
এটি হলো কোনো বস্তু বা সম্পদ ভাড়া দেওয়া। এখানে বস্তুর মালিকানা হাতবদল হয় না, শুধু ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়।
উদাহরণ: বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, মেশিনারিজ ভাড়া ইত্যাদি।

৩. ইজারা সহীহ (শুদ্ধ) হওয়ার শর্তাবলী
ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী ইজারা চুক্তি বৈধ হতে হলে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত মানতে হয়:
বস্তুর মালিকানা: ভাড়ায় প্রদত্ত বস্তুটি অবশ্যই ভাড়া দাতার (Lessor) মালিকানায় থাকতে হবে।

বস্তুর স্থায়িত্ব: এমন কোনো বস্তু ইজারা দেওয়া যাবে না যা ব্যবহারের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়।

উদাহরণ: টাকা, খাবার বা জ্বালানি তেল ইজারা বা ভাড়া দেওয়া যায় না (কারণ এগুলো ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায়)। কিন্তু গাড়ি বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া যায়।

হালাল ব্যবহার: হারাম কোনো কাজের জন্য ইজারা দেওয়া যাবে না।
উদাহরণ: মদের দোকান বা জুয়ার ক্যাসিনোর জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া জায়েজ নয়।

নির্দিষ্ট ভাড়া: ভাড়ার পরিমাণ (Rent) এবং সময়কাল চুক্তির শুরুতেই সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ:
সম্পদের মূল বা কাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণের (Major Maintenance) দায়িত্ব মালিকের (Lessor)।

সম্পদের দৈনন্দিন বা পরিচালনাগত রক্ষণাবেক্ষণের (Operational Maintenance) দায়িত্ব ভাড়াটিয়ার (Lessee)।

৬. ইজারা কখন বাতিল হয়?
ইজারাকৃত সম্পদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলে (যেমন: বাড়ি ধসে পড়লে)।
মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে।
উভয় পক্ষের সম্মতিতে চুক্তি বাতিল করলে।
ইজারা মূলত এমন একটি ব্যবস্থা যা মানুষের প্রয়োজনে একে অপরের সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ করে দেয় এবং এর মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক সচলতা বজায় থাকে।

৬.৪ বাই সালাম ও বাই ইসতিসনা

ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী, সাধারণত কোনো পণ্য নিজের মালিকানায় বা অস্তিত্বে না থাকলে তা বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তবে মানুষের প্রয়োজন ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে রাসুলুল্লাহ (সা.) 'বাই সালাম' এবং 'বাই ইসতিসনা'—এই দুটি বিশেষ পদ্ধতির অনুমতি দিয়েছেন। এই দুটিই মূলত অগ্রিম বেচাকেনার চুক্তি।

নিচে এই দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:
১. বাই সালাম (Bai Salam) - অগ্রিম ক্রয়
'সালাম' অর্থ হলো অগ্রিম। এটি এমন একটি চুক্তি যেখানে ক্রেতা পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য এখনই পরিশোধ করেন, কিন্তু বিক্রেতা পণ্যটি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট তারিখে বুঝিয়ে দেন।

মূল বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী:
নগদ ও পূর্ণ মূল্য পরিশোধ: চুক্তির সময়ই ক্রেতাকে (সাধারণত ব্যাংক বা অর্থায়নকারী) পণ্যের পুরো দাম বিক্রেতাকে (যেমন: কৃষক) পরিশোধ করতে হয়। বাকি রাখা যায় না।

পণ্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে: পণ্যের জাত, মান, পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্য একদম স্পষ্ট হতে হবে। (যেমন: ১০০ মণ মিনিকেট চাল)।
নির্দিষ্ট পণ্য নয়: কোনো নির্দিষ্ট বা অদ্বিতীয় বস্তু (যেমন: 'এই নির্দিষ্ট গরুটি' বা 'এই নির্দিষ্ট জমিটি') সালাম পদ্ধতিতে কেনা যায় না। যেসব পণ্য মাপে বা ওজনে বিক্রি হয় এবং বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় (যেমন: ধান, গম, তেল), শুধু সেক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য।

সরবরাহের তারিখ: পণ্য হস্তান্তরের তারিখ ও স্থান চুক্তিতে নির্দিষ্ট থাকতে হবে।
ব্যবহারিক উদাহরণ: একজন কৃষকের চাষাবাদের জন্য টাকার প্রয়োজন। ব্যাংক তাকে বলল, "আগামী ৬ মাস পর আপনি আমাদের ১০০ মণ ধান দেবেন, তার জন্য আজকের বাজার দরে আমরা এখনই আপনাকে ১ লক্ষ টাকা দিচ্ছি।" এটিই বাই সালাম।

২. বাই ইসতিসনা (Bai Istisna) - ফরমায়েশি ক্রয়
'ইসতিসনা' শব্দটি এসেছে 'সুনআ' থেকে, যার অর্থ তৈরি করা বা নির্মাণ করা। এটি এমন একটি চুক্তি যেখানে ক্রেতা কোনো প্রস্তুতকারককে (Manufacturer) নির্দিষ্ট কোনো পণ্য তৈরি করে দেওয়ার অর্ডার বা ফরমায়েশ দেন।

মূল বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী:
উৎপাদন বা নির্মাণ: এই চুক্তিটি কেবল এমন জিনিসের ক্ষেত্রে হয় যা তৈরি বা নির্মাণ করতে হয়। (যেমন: বাড়ি, জাহাজ, মেশিন, আসবাবপত্র)। প্রাকৃতিক পণ্য (যেমন: ধান, চাল) এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

উপকরণ সরবরাহ: পণ্য তৈরির কাঁচামাল বা উপকরণ অবশ্যই প্রস্তুতকারকের (Manufacturer) নিজস্ব হতে হবে। যদি ক্রেতা কাঁচামাল দেয় এবং প্রস্তুতকারক শুধু বানিয়ে দেয়, তবে তা ইসতিসনা হবে না, তা হবে 'ইজারা' (শ্রম বিক্রি)।

মূল্য পরিশোধের নমনীয়তা: সালামের মতো এখানে পুরো টাকা অগ্রিম দেওয়ার প্রয়োজন নেই। টাকা অগ্রিম, ধাপে ধাপে (Progressive) বা পণ্য বুঝে পাওয়ার পর—যেকোনো ভাবে পরিশোধ করা যায়।

সুনির্দিষ্ট বিবরণ: পণ্যটি কেমন হবে, তার নকশা, মান ও উপকরণের বিস্তারিত বিবরণ চুক্তিতে থাকতে হবে।

ব্যবহারিক উদাহরণ: একজন গ্রাহক একটি ১০ তলা বিল্ডিং বা একটি কাস্টমাইজড মেশিন বানাতে চান। তিনি ব্যাংকের (বা কনস্ট্রাকশন ফার্মের) সাথে চুক্তি করলেন। ব্যাংক ওই বিল্ডিংটি তৈরি করে গ্রাহককে বুঝিয়ে দেবে। গ্রাহক হয়তো কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে ধাপে ধাপে টাকা পরিশোধ করবেন। এটি বাই ইসতিসনা।

সারাংশ

সালাম হলো কৃষকদের বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কার্যকরী মূলধন (Working Capital) জোগানোর জন্য একটি চমৎকার পদ্ধতি।

ইসতিসনা হলো বড় শিল্প, রিয়েল এস্টেট বা প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি।

৬.৫ কর্জে হাসানা

কর্জে হাসানা (Qard al-Hasan) হলো ইসলামি অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় ঋণ প্রদানের সবচেয়ে সুন্দর ও মানবিক পদ্ধতি। আরবি শব্দ 'কর্জ' মানে ঋণ এবং 'হাসান' মানে উত্তম বা সুন্দর। শাব্দিক অর্থে একে বলা হয় 'উত্তম ঋণ'।

সহজ কথায়, কর্জে হাসানা হলো এমন একটি ঋণ, যেখানে ঋণদাতা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে টাকা ধার দেন এবং ফেরত নেওয়ার সময় কোনো অতিরিক্ত অর্থ (সুদ) দাবি করেন না। গ্রহীতা শুধু মূল টাকাটাই ফেরত দেন।

নিচে কর্জে হাসানা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. কর্জে হাসানার মূল বৈশিষ্ট্য

এই ঋণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

সুদবিহীন: এর মূল শর্ত হলো এটি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত হতে হবে। ১০০ টাকা ধার দিলে ফেরত আসবে ১০০ টাকাই।

উদ্দেশ্য: ঋণদাতার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক লাভ নয়, বরং মানুষের উপকার করা এবং পরকালে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পাওয়া।

মৌকুফের সুযোগ: ঋণগ্রহীতা যদি সত্যিই অভাবী হন এবং টাকা ফেরত দিতে অক্ষম হন, তবে ইসলাম ঋণদাতাকে ঋণ মাফ করে দেওয়ার বা সময় বাড়িয়ে দেওয়ার উৎসাহ দেয়।

২. কুরআনে কর্জে হাসানার গুরুত্ব
ইসলামে কর্জে হাসানাকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে একে 'আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।'

আল্লাহ বলেন,

"مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ "

“কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তাহলে আল্লাহ তা তার জন্য বহু গুণ বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন; আর তাঁর নিকটই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।”

আল্লাহ তাআলা কুরআনে আরো বলেছেন,

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

অনুবাদ:
“কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তাহলে আল্লাহ তা তার জন্য বহু গুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহৎ পুরস্কার।”
(সুরা হাদীদ: ৫৭:১১)

তিনি সুরা হাদীদে আরো বলেন,

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

“নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও নারী যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয় — তাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহৎ পুরস্কার।”
(সুরা হাদীদ: ৫৭:১৮)

৩. কর্জে হাসানার নিয়ম ও শর্তাবলী
ফিকহ বা ইসলামি আইন অনুযায়ী কর্জে হাসানার কিছু নিয়ম আছে:
লিখিত দলিল: ভবিষ্যতে যাতে কোনো বিবাদ না হয়, সেজন্য ঋণের পরিমাণ এবং ফেরত দেওয়ার সময় লিখে রাখা বা সাক্ষী রাখা উত্তম (সূরা বাকারা: ২৮২)।

অতিরিক্ত দেওয়া (স্বেচ্ছায়): ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় গ্রহীতা যদি খুশি হয়ে বা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মূল টাকার চেয়ে কিছু বেশি দেন (কোনো পূর্বশর্ত ছাড়া), তবে তা নেওয়া ঋণদাতার জন্য বৈধ বা জায়েজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও ঋণ পরিশোধের সময় উত্তমভাবে (বেশি বা ভালো মানের) ফেরত দিতেন।

শর্ত: তবে চুক্তির সময় বেশি দেওয়ার কোনো শর্ত বা চাপ থাকলে তা সরাসরি সুদ (Riba) হয়ে যাবে।

জোরজবরদস্তি না করা: ঋণগ্রহীতা যদি নির্দিষ্ট সময়ে টাকা ফেরত দিতে না পারেন, তবে তাকে সময় দেওয়া উচিত।

৬.৬ যাকাত, ওয়াকফ ও সাদাকা

৬.৬.১ যাকাত (Zakat) ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের (রোকন) মধ্যে তৃতীয়। এটি কোনো দান বা অনুদান নয়, বরং ধনীদের সম্পদে গরিবের ন্যায্য অধিকার।
আভিধানিক অর্থে যাকাত মানে হলো পবিত্রতা এবং বৃদ্ধি। যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র হয় এবং আল্লাহর বরকতে তা বৃদ্ধি পায়।

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এটি কেবল একটি দান বা আর্থিক সহায়তা নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ও ইবাদত ব্যবস্থা। কুরআনে নামাজের (সালাত) পরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাকাতকে।

যাকাত সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া রোধ করে, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার সচল রাখে, দারিদ্র্য বিমোচন করে। যাকাত হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা মানুষের লোভ নিয়ন্ত্রণ করে, অসহায়কে রক্ষা করে এবং অর্থনীতিকে সচল রাখে। এটি শুধু গরিবের উপকার নয়, বরং ধনীর নিজের সম্পদ এবং আখেরাত রক্ষার জন্যই বেশি প্রয়োজন।

৬.৬.২ সাদাকা (Sadaqah) হলো ইসলামি শরীয়তের একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। আরবি শব্দ ‘সিদক’ থেকে এটি এসেছে, যার অর্থ সত্যতা বা সততা।
ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় নিজের সম্পদ বা সামর্থ্য ব্যয় করাকে সাদাকা বলে। যেহেতু এই দানের মাধ্যমে বান্দা তার ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দেয়, তাই একে সাদাকা বলা হয়।

১. সাদাকার প্রকারভেদ
সাদাকাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:
ক. ওয়াজিব সাদাকা (আবশ্যিক দান)
যে সাদাকা আদায় করা বাধ্যতামূলক এবং না দিলে গুনাহ হয়। যেমন:
যাকাত: এটি ইসলামের রোকন এবং নির্দিষ্ট সম্পদের ওপর ফরজ।
সাদাকাতুল ফিতর: ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজের আগে আদায় করতে হয়।
মানত ও কাফফারা: কোনো মানত করলে বা কসম ভাঙলে যে জরিমানা দিতে হয়।

২.খ. নফল সাদাকা (ঐচ্ছিক দান)
সাধারণ অর্থে 'সাদাকা' বলতে আমরা এই নফল দানকেই বুঝি। এটি বাধ্যবাধকতা নয়, কিন্তু অনেক সওয়াবের কাজ। এটি আবার দুই প্রকার:

সাধারণ সাদাকা: গরিবকে টাকা দেওয়া, খাবার খাওয়ানো বা বস্ত্র দান করা। এর সওয়াব একবারই পাওয়া যায়।
সাদাকায়ে জারিয়া (প্রবহমান দান): এমন দান যার উপকারিতা দীর্ঘকাল ধরে মানুষ ভোগ করে এবং দাতা মৃত্যুর পরও কবরে সওয়াব পেতে থাকেন।
উদাহরণ: মসজিদ নির্মাণ, নলকূপ বসানো, এতিমখানা তৈরি, গাছ লাগানো বা দ্বীনি বই বিতরণ।

২. শুধু অর্থ নয়, ভালো কাজও সাদাকা
অনেকে মনে করেন সাদাকা শুধু টাকা-পয়সা দিয়েই করতে হয়। এটি ভুল ধারণা।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»

"প্রত্যেক ভালো কাজই সাদাকাহ।"

(হাদীস নং: ১০০৫, সহীহ মুসলিম)

টাকা ছাড়াই আপনি যেভাবে সাদাকা করতে পারেন:
কারও দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসা।

অন্ধকে পথ দেখানো বা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা, পাথর) সরিয়ে দেওয়া।

কারও বোঝা বা ভারী ব্যাগ উঠিয়ে দিতে সাহায্য করা।
কারও সাথে ভালো কথা বলা।

নিজের পরিবারের জন্য হালাল উপার্জন খরচ করা।
ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া।

৪. সাদাকার উপকারিতা ও ফজিলত
কুরআন ও হাদিসে সাদাকার অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে:
১.পাপ মোচন করে: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন.
الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ

(হাদীস নং ২৬১৬, সুনানে আত-তিরমিযী)

“এবং সাদাকা (যাকাত) বা দান খায়রাত) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এমনিভাবে গভীর রাতে ব্যক্তির কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুর)ও গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।

২. বিপদ দূর করে: সাদাকা আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু ও বড় বিপদ-আপদ (Bala-Musibat) রোধ করে।

৩. সম্পদ কমে না: বাহ্যিক দৃষ্টিতে টাকা কমলেও, আল্লাহ বলেছেন সাদাকা দিলে তিনি সম্পদ বাড়িয়ে দেন এবং বরকত দান করেন।

৪. কিয়ামতের দিন ছায়া: হাশরের ময়দানে যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন দানশীল ব্যক্তি তার দেওয়া সাদাকার ছায়ায় আশ্রয় পাবেন।

৫. সাদাকা দেওয়ার উত্তম নিয়ম

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُগোপনে দেওয়া: প্রকাশ্যে দেওয়া জায়েজ, তবে গোপনে দেওয়া উত্তম। مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ـ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ـ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ـ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ"

আবু হুরাইরা(রা.) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করবে, (আল্লাহ তা কবূল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত [৩৪] দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।

(সহীহ বুখারী, ১৪১০)

হালাল উপার্জন: হারাম টাকার সাদাকা আল্লাহ কবুল করেন না।

খোটা না দেওয়া: দান করে খোঁটা দিলে বা গ্রহীতাকে অপমান করলে সেই দানের সওয়াব বাতিল হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

হে ঈমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয়

করে থাকে, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মত, যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃত কার্যের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।"
(সুরা আল বাকারহ : আয়াত ২৬৪)

নিকটাত্মীয় দিয়ে শুরু করা: সাদাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের গরিব আত্মীয়-স্বজনরা সবার আগে হকদার। এতে দুটি সওয়াব—দানের সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সওয়াব।

সাদাকা হলো একটি সামাজিক ও আত্মিক সুরক্ষকবচ। এটি দাতার মনকে বড় করে এবং সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে সাহায্য করে।

৬.৬.৩ ওয়াকফ

ওয়াকফ (Waqf) হলো ইসলামি আইন ও অর্থনীতিতে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্থায়ী জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে একটি সম্পদকে চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।

আভিধানিক অর্থে 'ওয়াকফ' মানে হলো 'থামানো' বা 'স্থগিত করা'। ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায়, ওয়াকফ হলো:
"কোনো সম্পদের মূল মালিকানা (Principal) আল্লাহর নিকট স্থায়ীভাবে সমর্পণ করে, সেই সম্পদের ফল, আয় বা উপকারিতা (Usufruct) জনকল্যাণমূলক কাজে বা নির্দিষ্ট সুবিধাভোগীদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বরাদ্দ করা।"

সহজ কথায়, ওয়াকফ হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না, কিন্তু এর আয় বা সেবা ব্যবহার করা যায়। এটি এক ধরনের সাদাকায়ে জারিয়া (Sadaqah Jariyah)।

১. ওয়াকফের মূল ধারণা ও প্রক্রিয়া
ওয়াকফের ধারণা দুটি মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত:

১. মূল সম্পদ (Asl al-Mal) হস্তান্তর নিষিদ্ধ (Inalienable): একবার কোনো সম্পদকে ওয়াকফ ঘোষণা করলে তা আর বিক্রি, দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর করা যায় না। এটি আইনত আল্লাহর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়।

২. উপকারিতা স্থায়ী (Perpetual Benefit): মূল সম্পদ থেকে আসা ভাড়া, মুনাফা বা সুবিধাগুলো নির্ধারিত জনকল্যাণমূলক বা দাতব্য উদ্দেশ্যে অবিরামভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

২. ওয়াকফের পক্ষসমূহ ও ব্যবস্থাপনা
ওয়াকফ প্রক্রিয়ার প্রধান পক্ষসমূহ হলো:
ওয়াকফকারী (Waqif): যিনি সম্পদ দান করেন।

ওয়াকফ সম্পত্তি (Mawquf): যে সম্পদ দান করা হয় (যেমন: জমি, বাড়ি, নগদ অর্থ বা শেয়ার)।

সুবিধাভোগী (Mawquf Alaih): যারা ওয়াকফের সুবিধা লাভ করে (যেমন: দরিদ্র, মসজিদ, হাসপাতাল)।

মুতাওয়াল্লী (Mutawalli): ওয়াকফ সম্পত্তির দেখাশোনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বা ট্রাস্টি বোর্ড।

৩. ওয়াকফের প্রকারভেদ
উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে ওয়াকফ প্রধানত দুই প্রকার:

ওয়াকফ খাইরী (Waqf Khairi) জনকল্যাণমূলক ওয়াকফ। এর সুবিধা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ ভোগ করে। (যেমন: মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সেতু নির্মাণ)।

ওয়াকফ আহলী বা ধুর্রী (Waqf Ahli / Dhurrie) পারিবারিক ওয়াকফ। এর সুবিধা প্রথমে দাতার নিজের পরিবার ও বংশধরদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। তাদের পরে বা সুবিধাভোগী না থাকলে এটি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪. ওয়াকফ সহীহ হওয়ার শর্তাবলী

ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী একটি ওয়াকফ চুক্তি বৈধ হতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়:
স্থায়ীত্ব: ওয়াকফ অবশ্যই চিরস্থায়ী হতে হবে। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতে পারে না।

মালিকানা: ওয়াকফকারীকে অবশ্যই সেই সম্পদের পূর্ণ ও বৈধ মালিক হতে হবে।

সম্পদের প্রকৃতি: সম্পদটি অবশ্যই এমন হতে হবে যা ব্যবহারের ফলে শেষ হয়ে যায় না (Non-Consumable)। যেমন: জমি, দালান, বা শেয়ার। নগদ অর্থও ওয়াকফ করা যায়, যা বিনিয়োগ করে তার মুনাফা দাতব্য কাজে ব্যবহার করা হয়।

উদ্দেশ্য: ওয়াকফের উদ্দেশ্য অবশ্যই হালাল ও শরীয়তসম্মত হতে হবে।

সুনির্দিষ্টতা: ওয়াকফকারীকে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি কাকে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে সুবিধাভোগী হিসেবে মনোনীত করছেন।

৫. ওয়াকফের ঐতিহাসিক ও আধুনিক গুরুত্ব
ওয়াকফ হলো সাদাকায়ে জারিয়ার সবচেয়ে উত্তম ও সুসংগঠিত রূপ। এর গুরুত্ব নিম্নরূপ:
চিরন্তন সওয়াব: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষ মারা গেলে তিনটি কাজ ছাড়া তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়: ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. উপকারী জ্ঞান, এবং ৩. নেক সন্তান। ওয়াকফ হলো সরাসরি সাদাকায়ে জারিয়া।

সামাজিক নিরাপত্তা: ইতিহাসজুড়ে ওয়াকফ শিক্ষা, চিকিৎসা, এবং সামাজিক অবকাঠামো (যেমন: সরাইখানা, পানীয় জলের ব্যবস্থা) নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে।

আর্থিক উপকরণ: আধুনিক ইসলামি অর্থনীতিতে 'সুকুক আল-ওয়াকফ' (Waqf Bonds) ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে স্থায়ী জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো অর্থায়ন করা হয়।

ওয়াকফকে ইসলামি সভ্যতার অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা কোনো প্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

৬.৮ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ:

ইসলামী অর্থনীতি একদিকে ন্যায়, সাম্য, শোষণমুক্তি ও মানবকল্যাণের আদর্শ ধারণ করে; অন্যদিকে বাস্তব প্রয়োগে অনেক সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। তবে এ চ্যালেঞ্জসমূহের কার্যকর সমাধান বাস্তবায়ন করলে ইসলামী অর্থনীতি একটি টেকসই, ন্যায্য ও মানবিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

চ্যালেঞ্জ (Challenges)

1. বিশ্বব্যাপী সুদ-নির্ভর অর্থনীতির আধিপত্য
IMF, World Bank, আন্তর্জাতিক বন্ড ও মানি মার্কেট — সবই সুদনির্ভর। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থনীতি আলাদা এক সিস্টেম হিসেবে দাঁড়াতে সংগ্রাম করে।

2. উদ্ভাবনী আর্থিক পণ্যের অভাব
Conventional market-এ derivatives, hedging, futures, options—সহ বিভিন্ন যন্ত্র রয়েছে; ইসলামী অর্থনীতিতে এগুলোর শরিয়াহ সম্মত বিকল্প কম।

3. Awareness ও ফিনান্সিয়াল লিটারেসি কম
সাধারণ জনগণ ইসলামী ফাইন্যান্সের চুক্তি, নীতিমালা, সুবিধা-এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না।

4. সরকারি নীতিগত সহায়তার সীমাবদ্ধতা
অনেক দেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন, নিয়ন্ত্রক কাঠামো, কর সুবিধা—এসব পুরোপুরি উন্নত নয়।

5. Risk-sharing ভিত্তিক অর্থায়নে বিনিয়োগকারী ঝুঁকি নিতে চান না
বিনিয়োগকারীরা লাভে অংশ নিতে চাইলেও ক্ষতিতে অংশ নিতে চান না—যা ইসলামী নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

অধ্যায় - ৭: তুলনামূলক অধ্যয়ন: দাসত্ব বনাম জিহাদ(Comparative Study: Slavery vs. Jihad)

৭.১ দুটি ধারার তুলনা

সুদ: আধুনিক দাসত্বের এক রূপ

ইসলামে সুদকে কেবল অর্থনৈতিক অপরাধ বলা হয়নি, বরং তার প্রভাবকে দাসত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেন?

(১) সুদ মানুষকে চক্রব্যূহে ফেলে

মূলধনের উপর সুদ বাড়তেই থাকে

ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যতই পরিশোধ করুক, ঋণ কমে না—বরং বাড়ে

এ অবস্থাকে আধুনিক অর্থনীতিতে “Debt Trap” বা ঋণের ফাঁদ বলে

এটা দাসত্বের কাছাকাছি, কারণ—

ঋণদাতা লাভ করে

ঋণগ্রহীতা সারাজীবন পরিশ্রম করেও মুক্ত হতে পারে না।

(২) গরিব আরও গরিব হয়

সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি ধনীদের সম্পদ বাড়ায়, গরিবদের সম্পদ সংকুচিত করে।
যেখানে:

ধনীরা সুদ খেয়ে আরও ধনী হয়

গরিবরা সুদ দিয়ে কষ্টে পরে

এটা সমাজে শোষণ ও দাসত্ব তৈরি করে।

(৩) সুদ মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়

যখন কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ঋণে ডুবে যায় (যেমন IMF/World Bank):

তাদের নীতিতে হস্তক্ষেপ করা হয়

সরকারকে চাপ দিয়ে বাজেট, কর, পণ্যদাম নিয়ন্ত্রণ করানো হয়

এগুলো সরাসরি রাজনৈতিক দাসত্বের রূপ।

অপরদিকে,

ইসলামে জিহাদ মানে কেবল যুদ্ধ নয়।
বরং—

"অন্যায়, শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম।"

সুতরাং সুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো =
অন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

কীভাবে এটা জিহাদের মতো?

(১) নৈতিক সংগ্রাম

সুদ ছাড়তে গেলে মানুষকে নিজস্ব লোভ দমন করতে হয়।
এটা আত্মিক জিহাদ (Jihad an-Nafs)।

(২) অর্থনৈতিক জিহাদ

সুদভিত্তিক সিস্টেম থেকে সরে গিয়ে:

শেয়ার্ড রিস্ক

ন্যায়ভিত্তিক ব্যবসা

মুনাফা-বণ্টন

যাকাত ও সদকার শক্তিশালী ভূমিকা
এসব প্রতিষ্ঠা করা—
একটি ন্যায়সঙ্গত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জিহাদ।

(৩) সামাজিক জিহাদ

যখন একটি সমাজ সুদমুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলে:

শোষণ কমে

গরিবের প্রতি ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়

অর্থনৈতিক ভারসাম্য আসে

এটা সমাজ-সংস্কারমূলক সংগ্রাম, অর্থাৎ জিহাদ।

আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সুদ মুসলিমদের জন্য দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য এক আবশ্যকীয় জিহাদ।

৭.২ অর্থনৈতিক ও ন্যায়বিচারের নিরিখে তুলনা

দাসত্ব

দাস শ্রম ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও সম্পদ উপরে উপরে কেন্দ্রীভূত হয়।

সমাজে চরম বৈষম্য, শোষণ ও জুলুম সৃষ্টি হয়।

ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে এটি সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য।

জিহাদ

অর্থনৈতিক জিহাদের উদ্দেশ্য শোষণ দূর করা, সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করা।

জাকাত, ফিতরা, সদকা, কর্জে হাসানা—এগুলো জিহাদের অর্থনৈতিক রূপ, যা অর্থনৈতিক দাসত্বের বিপরীত।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই এর মূল অর্থনৈতিক দর্শন।

সারসংক্ষেপ

দাসত্ব অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করে,
জিহাদ অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

৭.৩ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনটি বেশি কার্যকর

টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা

১. সুদভিত্তিক অর্থনীতি (Interest-based Economy)

অর্থনৈতিক বৈষম্য: সুদভিত্তিক অর্থনীতি মূলত ঋণ-ঋণদাতা সম্পর্কের ওপর চলে। এটি মূলধন সমৃদ্ধদের জন্য সুবিধাজনক, দরিদ্রদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ভারবহনযোগ্য হয় না।

দারিদ্র্য বৃদ্ধি: ঋণের উপর অতিরিক্ত সুদ জমা হওয়ার কারণে দরিদ্রদের সম্পদ ধ্বংস হয়, আর ধনী আরও ধনী হয়।

সামাজিক প্রভাব: সমাজে অসাম্য, শোষণ ও আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পায়।

উন্নয়নের স্থায়িত্ব: মূলধন ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু টেকসই ও ন্যায্য উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না।

সারসংক্ষেপ:
সুদভিত্তিক অর্থনীতি দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২. ইসলামভিত্তিক অর্থনীতি (Islamic Economy)

সুদবিহীন আর্থিক ব্যবস্থা: কর্জে হাসানা, মুদারাবা, মুশারাকা, জাকাত ও সদকা—এসব মূল নীতি।

ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বণ্টন: সম্পদ সমাজের সব স্তরে পৌঁছায়, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সামাজিক সংহতি: দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজে সংহতি বৃদ্ধি পায়।

টেকসই উন্নয়ন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

নৈতিক ও মানসিক উন্নয়ন: স্বার্থপরতা ও লোভ কমিয়ে, সহযোগিতা ও দানশীলতা বৃদ্ধি করে।

সারসংক্ষেপ:
ইসলামভিত্তিক অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদে সমতা, ন্যায় ও স্থায়িত্বপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

উপসংহার

টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে:

সুদভিত্তিক অর্থনীতি: দ্রুত লভ্যাংশ দিতে পারে কিন্তু বৈষম্য ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

ইসলামভিত্তিক অর্থনীতি: দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

সুতরাং টেকসই উন্নয়নের জন্য ইসলামভিত্তিক অর্থনীতি বেশি কার্যকর।

অধ্যায় -৮:উপসংহার ও সুপারিশ (Conclusion and Recommendations)

৮.১ গবেষণার প্রধান ফলাফলের সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Interest-based economy) দীর্ঘমেয়াদে মুসলিম সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, নির্ভরশীল ও শোষিত অবস্থায় নিয়ে যায়। সুদ এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে সম্পদের সুষম প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সবাই এক প্রকার আধুনিক দাসত্বের চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

অপরদিকে, ইসলামী অর্থনীতি—বিশেষত কর্জে হাসানা, মুদারাবা, মুশারাকা, যাকাত, ওয়াকফ, ও রিবাবিহীন লেনদেন—সমাজে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

ফলে গবেষণার সারমর্ম হলো, সুদভিত্তিক অর্থনীতি মুসলিমদের জন্য দাসত্বমুখী, আর ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়বিচার, উৎপাদনশীলতা ও স্বাধীনতার পথে জিহাদি সংগ্রামের সমতুল্য একটি সিস্টেম।

৮.২ উত্তরণের পথ: বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতির একীকরণের কৌশল

ইসলামী অর্থনীতিকে বিশ্বব্যবস্থায় সফলভাবে একীভূত করতে নিচের কৌশলগুলো গুরুত্বপূর্ণ:

১. ইসলামী ফাইন্যান্সের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

ইসলামী ব্যাংক, তাকাফুল, ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স—এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত করা।

আন্তর্জাতিক মানসম্মত শরিয়াহ বোর্ড প্রতিষ্ঠা।

২. সুদমুক্ত বিকল্প মডেলের প্রসার

মুদারাবা-মুশারাকা ভিত্তিক স্টার্টআপ ফাইন্যান্সিং।

কৃষি ও এসএমই সেক্টরে সুদবিহীন ঋণ ব্যবস্থা।

৩. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি ও আইন সংস্কার

ধীরে ধীরে সুদভিত্তিক লেনদেন কমিয়ে শরিয়াহ অনুযায়ী আর্থিক কাঠামো গঠন।

যাকাত, ওয়াকফ ও সাদাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত করা।

৪. শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ

ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব।

ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ।

৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ইকোনমিক ব্লক তৈরি

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ইসলামী অর্থনৈতিক জোট গঠন।

বৈশ্বিক পর্যায়ে সুদমুক্ত বন্ড (সুকুক) বাজার উন্নয়ন।

৮.৩ ভবিষ্যত গবেষণার ক্ষেত্র

এ ক্ষেত্রটি অত্যন্ত বিস্তৃত, যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে গবেষণার সুযোগ রয়েছে:

১. সুদভিত্তিক অর্থনীতির সামাজিক প্রভাব

ব্যক্তিগত মানসিক চাপ, পারিবারিক সংকট, সামাজিক বৈষম্য—এসব দিক বিশ্লেষণ।

২. সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের দক্ষতা তুলনামূলক গবেষণা

ইসলামী ব্যাংক বনাম প্রচলিত ব্যাংক—কোনটি অধিক টেকসই, উৎপাদনশীল এবং ন্যায়সংগত।

৩. ওয়াকফ ও যাকাত ব্যবস্থার জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান

ওয়াকফের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি উন্নয়ন—এসব ক্ষেত্রে ম্যাক্রোইকোনমিক বিশ্লেষণ।

৪. প্রযুক্তিভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি

ব্লকচেইনভিত্তিক শরিয়াহ-সম্মত স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, ক্রিপ্টো-হালাল ফাইন্যান্স ইত্যাদি।

৫. দাসত্ব-জিহাদ কাঠামোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সুদকে দাসত্ব এবং ইসলামী অর্থনীতিকে অর্থনৈতিক জিহাদের শক্তি হিসেবে তুলে ধরা তাত্ত্বিক মডেল তৈরি।

৮.৪ চূড়ান্ত মন্তব্য: দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য জিহাদের ডাক

সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা মানবজাতিকে সার্বিকভাবে এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে—যা একধরনের অর্থনৈতিক দাসত্ব। ইসলামী অর্থনীতি সেই শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তির পথ দেখায়। এই মুক্তির সংগ্রাম কোনো অস্ত্রধারী যুদ্ধ নয়; বরং এটি নৈতিকতা, ন্যায্যতা, উৎপাদনশীলতা ও মানবকল্যাণের পথে একটি অর্থনৈতিক জিহাদ।
এটি হলো—
সমাজকে শোষণমুক্ত করা, সম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টন নিশ্চিত করা এবং বিশ্বকে একটি মানবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম।

তথ্যসূত্র

আল-কুরআন
হাদীস

বইসমূহ:
ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান: মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

সুদ: একটি পরিষ্কার বিদ্রোহ: মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রহ.)
মুফতি তাকী উসমানী

সুদ হারাম, কর্জে হাসানা একটি সমাধান: মুহাইমিন পাটোয়ারী

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি: মুহাইমিন পাটোয়ারী

ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য: মুহাইমিন পাটোয়ারী

ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন: মাওলাা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া।

অনলাইন তথ্যসূত্র